ইউরোপে ইসলামের আলো

বসনিয়া–হারজেগোভিনা



এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম

আশা প্রকাশন

ইউরোপে ইসলামী আলো

বসনিয়া–হারজেগোভিনা



এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম

আশা প্রকাশন

প্রকাশিকাঃ
আশা প্রকাশনের পক্ষে
তামান্না
আশা-৫

প্রকাশকালঃ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

কম্পিউটার কম্পোজঃ
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্যঃ পনের টাকা মাত্র

মূদ্রণেঃ
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

ভূমিকা

বসনিয়া-হারজেগোভিয়ার মুসলমানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সেজন্য তাদের উপর চলছে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক ও জঘন্যতম অত্যাচর নির্যাতন। আজ সেখানে লক্ষ লক্ষ বনি আদম সর্বহারা ও উদ্বাস্তু।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কি আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও জানা-শুনার প্রয়োজন আছে? এ ব্যাপারে আমরা গাফিল ও উদাসীন থাকলে কি কোন ক্ষতি আছে? এই প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেনঃ

مَنْ لَّمْ يَهْتَمَّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ -

অর্থঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের সমস্যার বিষয়ে মাথা ঘামায় না, সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই হাদীস পরিষ্কার বলছে, মুসলমান থাকতে হলে মুসলমানদের সমস্যার বিষয়েও মাথা ঘামাতে হবে। মাথা না ঘামালে সে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে আমাদেরকে বসনিয়াসহ অন্যান্য জায়গার মুসলমানদের সংকট কি তা জানতে হবে এবং সেজন্য কি করণীয় তা চিন্তা করতে হবে।

ইসলাম এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেই বেশী বিস্তার লাভ করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের তেমন একটা বেশী প্রসার হয়নি। তাই সেখানে ইসলামের প্রসারের গুরুত্ব সর্বাধিক। ইউরোপের প্রথম মুসলিম দেশ হচ্ছে, আলবেনিয়া। দ্বিতীয় দেশ হচ্ছে, বসনিয়া-হারজেগোভিনা। তারপর আশা করা যায় যে, মাকদুনিয়া, কসোভো এবং সঞ্জকও স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ মুসলমানদের কল্যাণ দান করুন।

এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা,
২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৯২।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়ঃ	যুগোশ্লাভিয়ার পরিচিতি	
২য় অধ্যায়ঃ	যুগোশ্লাভিয়ার ইতিহাস	
৩য় অধ্যায়ঃ	যুগোশ্লাভিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহ (বসনিয়া–হারজেগোভিনা ও মুসলিম অঞ্চলগুলোসহ)	
৪র্থ অধ্যায়ঃ	যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলাম	
৫ম অধ্যায়ঃ	বসনিয়া–হারজেগোভিনার মুসলমানের বিরুদ্ধে সার্বিয়ান আগ্রাসনের কারণ	
৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ	সার্ব–বাহিনীর করুণ নির্যাতন	
৭ম অধ্যায়ঃ	বসনিয়া–হারজেগোভিনার যুদ্ধের অবস্থা	
৮ম অধ্যায়ঃ	বসনিয়া–হারজেগোভিনার সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	
৯ম অধ্যায়ঃ	বসনিয়া–হারজেগোভিনায় আন্তর্জাতিক সাহায্য	
১০ম অধ্যায়ঃ	বসনিয়া–হারজেগোভিনার প্রেসিডেন্টের পরিচিতি	
১১শ অধ্যায়ঃ	মুসলমানরা গর্জে উঠ	

১ম অধ্যায়

যুগোশ্লাভিয়ার পরিচিতি

যুগোশ্লাভিয়া দিক্ষণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ও বলকান দ্বীপের পশ্চিমে এবং এড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ, গ্রীস, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরীকে নিয়ে বলকান দ্বীপ গঠিত।

সীমানা

পূর্বে-বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া, পশ্চিমে -এড্রিয়াটিক সাগর, উত্তরে -হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া এবং দক্ষিণে -আলবেনিয়া ও গ্রীস অবস্থিত।

মোট আয়তন ২লাখ ৫৫ হাজার ৮০৪ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী বেলগ্রেড।

যুগোশ্লাভিয়া নামক রাষ্ট্রটি ইউরোপীয় মানচিত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আবির্ভূত হয়।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহ

৬টি প্রজাতন্ত্র ও ৩টি অঞ্চল নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রগুলো হচ্ছেঃ

১· সারবিয়া-রাজধানী বেলগ্রেড ২· মন্টেনেগ্রো- রাজধানী টিটোগ্রাড, ৩· স্লভেনিয়া -রজধানী লিওবিজানা, ৪· ক্রেশিয়া -রাজধানী যাগরেব, ৫· বসনিয়া-হারজেগোভিনা -রাজধানী সারাজেভো ৬· স্কোপজী মাকদুনিয়া -রাজধানী স্কোপজী।

৩টি অঞ্চল হচ্ছেঃ

১· কসোভো -রাজধানী প্রিস্টিনা, ২· বজভোদিনা -রাজধানী নভিসাদ, ৩· সঞ্জক -রাজধানী নওবীবাজার।

যুগোশ্লাভিয়ার মোট ২০টি সম্প্রদায় বাস করে। তাদের প্রত্যেকের পৃথক আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। তবে তিনটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১· সার্বো-ক্রোট ভাষা, ২· স্লভেনিয়ান ভাষা ও ৩· মাকদুনিয়ান ভাষা।

ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া

সাধারণভাবে, যুগোশ্লাভিয়া পাহাড়ী এলাকা। পশ্চিমাঞ্চলের তিন চতুর্থাংশ পাহাড়ী ভূমি। সেখানকার প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম হচ্ছে, আল্প পাহাড়। কোন কোন অংশে ঐ পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে, ২৮৬৫ মিটার এবং তাতে রয়েছে কঠিন শিলা।

সেখানে নদী–নালাও রয়েছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন খুবই কম। এরপর রয়েছে বিরাট বনভূমি। অনেকগুলো ছোট খাল সাভা নদীতে গিয়ে মিশেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে রয়েছে বিরাট সমভূমি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দানুব সমভূমি এবং এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দানুব নদী। নদীটির দৈর্ঘ হচ্ছে ১৪০০ কিলোমিটার।

যুগোশ্লাভিয়ার আবহাওয়া প্রধানত দুই প্রকারঃ ১· ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া এবং ২· মহাদেশীয় আবহাওয়া। পশ্চিম যুগোশ্লাভিয়ায় প্রচণ্ড গরম ও মাঝারী শীত পড়ে। তবে সেখানে বৃষ্টিপাত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরে মহাদেশীয় আবহাওয়ার ফলে প্রচণ্ড গরম ও শীত পড়ে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়। বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম–বেশ হয়। তবে এড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় বেশী বৃষ্টিপাত হয়।

জনসংখ্যা ও পেশা

যুগোশ্লাভিয়ার ২০টি সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায় খৃষ্টান। কেউ ক্যাথলিক খৃষ্টান, অর্থাৎ রোমান গীর্জার অনুসারী। আর কেউ আছে অর্থডক্স বা গোঁড়া খৃষ্টান। তবে দেশে বিরাট সংখ্যক মুসলমানও আছে।

সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বর্ণ রয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় লোকদেরকে স্লাভ বলা হয়। তারা হচ্ছে, সার্ব, ক্রোট ও খৃষ্টান।

অন্যদের মধ্যে আছে বাসনাক মুসলিম। তারা বসনিয়া–হারজেগোভিনায় বাস করে। এছাড়াও আছে তুর্কী এবং আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত লোক। অন্যান্য সম্প্রদায়ও রয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে আড়াই কোটি। পাহাড়ী এলাকায় লোক বসতি কম এবং সমতল ভূমিতে লোক বসতি বেশী। সর্বাধিক ঘনবসতি হচ্ছে বেলগ্রেড, স্লভেনিয়া, জাগরেব ও বসনিয়া–হারজেগোভিনায়। যুগোশ্লাভিয়ায় মোট ৬০ লাখের অধিক মুসলমান বাস করে।

যুগোশ্লাভিয়ার অর্ধেক সংখ্যক লোকের পেশা কৃষি। কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে দেশটি দুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত। ১· উত্তরাঞ্চলীয় সমভূমি ও পার্শ্ববর্তী উপত্যকাসমূহ। এই অঞ্চলে গমসহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। ২· দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সাপা উপত্যকা। এটি দানুব নদীর নিকট অবস্থিত। এই অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর বন–জঙ্গল ও চারণ ভূমি। এ এলাকায় গম, যব ও তুট্টা জন্মে। যুগোশ্লাভিয়ায় বার্ষিক কয়েক মিলিয়ন টন গম, ১০ লাখ টনেরও বেশী যব উৎপাদন হয়। এছাড়াও অন্যান্য কৃষি পণ্য পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়।

পশু, খনিজ সম্পদ এবং শিল্প

যুগোশ্লাভিয়া পশু সম্পদে সমৃদ্ধ। সেখানে ৭০ লাখের বেশী গবাদি পশু এবং ১ কোটির বেশী ছাগল ও দুম্বা রয়েছে। এছাড়াও সেখানে ভেড়াসহ অন্যান্য আরো বহু গৃহপালিত পশু রয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় বিভিন্ন খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। সেখানে বিরাট পরিমাণ লোহা রিজার্ভ আছে। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের পর যুগোশ্লাভিয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম সিসা উৎপাদনকারী দেশ। এছাড়াও যুগোশ্লাভিয়ায় রয়েছে রূপা ও তামাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ। সেখানে কয়লা এবং পরিমিত তেল ও গ্যাস রয়েছে।

পানি সম্পদ ও প্রচুর নদী–নালার কারণে যুগোশ্লাভিয়া বিদ্যুত উৎপাদন করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেখানে শিল্পায়নের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সেখানে খনিজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত শিল্প, মোটরগাড়ী এবং রেলগাড়ী তৈরী হয়। কৃষির পরে শিল্প হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়ার দ্বিতীয় প্রধান পেশা। সেখানে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ২০ লাখেরও অধিক।

সামরিক শক্তি

ফেডারেল যুগোশ্লাভ সরকারের সেনাবাহিনীতে সার্বিয়ানদের প্রাধান্য রয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া পৃথিবীর ১০ম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি এবং ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তির অধিকারী বলে খ্যাত। ফেডারেল বাহিনীতে রয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার নিয়মিত সৈন্য, ৪শ ট্যাংক, ৬শ সাঁজোয়া গাড়ী, ১৫০ টি জঙ্গী বিমান, গোলন্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনী অস্ত্রসহ অন্যান্য প্রচুর সমরাস্ত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুগোশ্লাভ বাহিনী যথেষ্ঠ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাই সবাই যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক শক্তিকে হিসেব করে।



যুগোশ্লাভিয়ার মানচিত্র

২য় অধ্যায়

যুগোশ্লাভিয়ার ইতিহাস

যুগোশ্লাভিয়ার উপর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শাসন চলাকালীন সময়ে সার্ব সম্প্রদায় তাদের কাছ থেকে গোঁড়া খৃষ্টধর্মমত (অর্থডক্স) গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা বইজানটাইন শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং মধ্যযুগে একটি সম্পদশালী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়।

সার্ববাহিনীর সাথে তুর্কী মুসলিম খলীফা ওসমানীদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব শাসক পরাজিত হয়।

প্রথমে তুর্কী ওসমানী খলীফা প্রথম মুরাদ বলকান দেশগুলোর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত তদানীন্তন যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তে পৌছে যান। সার্বিয়ার তদানীন্তন প্রেসিডি ন্ট লাযার তার দেশের সীমান্তে ওসমানী শাসনের আগমনকে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি বিবেচনা করে অন্যান্য বলকান দেশগুলোর প্রতি সামরিক জোট গঠনের আহ্বান জানান। লাযার বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া ও সার্বিয়া সমন্বয়ে এক বিরাট সামিরক জোট গঠনে সক্ষম হন।

১৩৮৯ খৃঃ ১৫ই জুন, কসোভোর সমতল ভূমিতে সুলতান মুরাদের বাহিনীর সাথে বলকান বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ওসমানী সুলতান জয়লাভ করেন এবং বলকান সম্মিলিত বাহিনী পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে বলকানের অনেক রাজা ও শাসক নিহত হয়। এদের মধ্যে সার্ব রাজা লাযার অন্যতম। তখন থেকে সার্বিয়া ওসমানী সুলতানের শাসনাধীনে আসে। তারা বেলগ্রেডে পৌছে যান।

যুদ্ধ শেষে তুর্কী সুলতান ১ম মুরাদ নিজেও নিহত হন। তিনি আহত সৈন্যদেরকে পরিদর্শন করতে যান। তখন একজন আহত সার্ব সেনা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁর হাতে চুমো দেয়ার আবদার করে আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। ফলে, সুলতান মারা যান।

সার্ব সম্প্রদায় প্রতিবছর ২৮শে জুন এই স্মরণীয় দিবসটি পালন করে অথচ ঐতিহাসিকদের মতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৫ই জুন। পক্ষান্তরে ২৮শে জুন আরেকটি দুঃখজনক ঘটনার স্মারক। ১৯১৪ সালে একজন সার্ব সেনা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সম্রাটের যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ডকে সারাজেভোর রাস্তায় হত্যা করে। এই বিষাদময় ঘটনা ১ম মহাযুদ্ধের ইন্ধন যোগায়। প্রশ্ন জাগে, তাহলে সার্ব সম্প্রদায় কি ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার খুশীতে ২৮শে জুন পালন করে? রক্তপাত ও হত্যাই যাদের চরিত্র, এটা তাদের জন্য মোটেই আশ্চর্যজনক কিছু নয় বৈ কি!

১৪৬৩ খৃঃ তুর্কী মুসলিম শাসকরা যুগোশ্লাভিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তখন থেকে যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলিম শাসন শুরু হয়।

এর পর দীর্ঘ ৪শ বছর পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার উপর তুর্কী মুসলিম ওসমানী শাসন অব্যাহত থাকে।

কিন্তু ১৮০৪-১৮১৫ খৃঃ, সার্ব সম্প্রদায় তুর্কী মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তারপর সেখানে ক্রমান্বয়ে তুর্কী শাসন দুর্বল হতে থাকে। তুরস্কের ওসমানী খলীফারাও দুর্বল হযে পড়ায় এ মন্দা অবস্থা দেখা দেয়।

১৮৭৮ খৃঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য যুগোশ্লাভিয়ায় তুর্কী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে ওসমানী খলীফা পরাজিত হন। তারপর সেখানে অস্ট্রিয়ান-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুরু হয় এবং তুর্কী শাসনের অবসান হয়।

১ম বিশ্বযুদ্ধে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পরাজয়ের পর ১৯১৭ সালে লণ্ডনে যুগোশ্লাভ কমিটি 'কার্ভো চুক্তি' স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী যুগোশ্লাভিয়ায় একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রথমবারের মত যুগোশ্লাভিয়ায় সার্ব শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। ১৯১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর, 'সার্বিয়া-ক্রোশিয়া-স্লভেনিয়া নামক একটি দেশ গঠন করা হয়। ১৯২৯ খৃঃ এই লম্বা নামের পরিবর্তন করে 'যুগোশ্লাভিয়া' নামকরণ করা হয়।

যুগোশ্লাভিয়াকে ইংরেজীতে 'ইয়োগোশ্লাভিয়া' বলে। 'ইয়োগো' অর্থ-দক্ষিণাঞ্চলীয় এবং 'স্লাভ' অর্থ স্লাভ সম্প্রদায়। ইয়োগোশ্লাভিয়া অর্থঃ 'দক্ষিণাঞ্চলীয় স্লাভ সম্প্রদায়'।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী ও ইটালী যুগোশ্লাভিয়া দখল করে কিন্তু যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর যুগোশ্লাভিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। তারপর জোশেফ মার্শাল টিটোর সমর্থকরা সেখানে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালের ২৯ শে নবেম্বর মার্শাল টিটো যুগোশ্লাভ ফেডারেশন গঠন করেন। তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

মার্শাল টিটো ১৯৮০ খৃঃ মারা যান। ৮০-এর দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে সমাজতন্ত্রের অসার তত্ত্ব ও শাসন বিদায় নেয়ায় যুগোশ্লাভিয়ায়ও সমাজতন্ত্রের ধস নেমে আসে। তাই ১৯৮৯ খৃঃ যুগোশ্লাভিয়া থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় নেয়। তারপর সেখানে সার্ব সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

সর্ব সম্প্রদায় নিজেদেরকে যুগোশ্লাভিয়ার একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে এবং দেশ শাসনের একচেটিয়া অধিকার দাবী করে। ফলে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ও জেগে উঠে। এছাড়াও দীর্ঘ দিন সমাজতান্ত্রিক নির্যাতন এবং বেলগ্রেডভিত্তিক সার্ব নিয়ন্ত্রিত সরকারের শোষণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে।

যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানরাই ছিল সর্বাধিক নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। এখন আমরা প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করবো।

৩য় অধ্যায়

যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্রসমূহঃ

১. সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র

সার্বিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ক্রোশিয়া, উত্তর-পূর্বে হাঙ্গেরী ও রোমানিয়া, পূর্বে বুলগেরিয়া, দক্ষিণে মাকদুনিয়া এবং পশ্চিমে আলবেনিয়া, মালন্টোগ্রো ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা অবস্থিত।

সার্বিয়ার মধ্যে তিনটি অঞ্চল আছে। সেগুলো ব্যতীত সার্বিয়ার আয়তন ৪৭,৩০১ বর্গ কিলোমিটার। আর সেগুলোসহ সাবিয়ার মোট আয়তন হচ্ছে, ৮৮ হাজার ৩৬১ বর্গ কিলোমিটার।

সার্বিয়ার মোট লোক সংখ্যা হচ্ছে ৯০ লাখ ৭৬ হাজার। তিন অঞ্চলের লোক সংখ্যা ব্যতীত সার্বিয়ার জনসংখ্যা হলো, ৮৩ লাখ ৮৮ হাজার ২২৮ জন।

তাদের মধ্যে সার্ব ৬৫%, হাঙ্গেরীয়ান ৩·৫%, আলবেনিয়ান ও অন্যান্য মুসলিম ১৯·৬% এবং অন্যান্য হচ্ছে, ১১·১%।

১৯৯২ সালের ২৭শে এপ্রিল সার্ব প্রভাবিত যুগোশ্লাভ পার্লামেন্ট সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোকে নিয়ে নতুন যুগোশ্লাভ ফেডারেশন ঘোষণা করে। স্লভোদন মিলোসেভিককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়।

স্লভোদন মিলোসেভিক স্বাধীনতাকামী প্রজাতন্ত্রগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ শুরু করেন। তিনি যুগোশ্লাভ বাহিনীকে ক্রোশিয়া, স্লাভেনিয়া ও বসনিয়া-হারজেগোভিনিয়ায় পাঠিয়েছেন। স্লভেনিয়া ও ক্রোশিয়ার সামরিক অভিযান শেষ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সকল সামরিক শক্তি নিয়োজিত করেছেন। সেখানে নিরস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রীয় সকল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সালে যুগোশ্লাভিয়াকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

২. মন্টেনেগ্রোঃ

মন্টেনেগ্রোর অপর নাম হচ্ছে, কৃষ্ণ পাহাড়। ১৩৫৫ খৃঃ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর শাসন ভেঙ্গে পড়ার পর মন্টেনেগ্রো প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় এবং তা কখনও তুর্কী শাসনের অধীন ছিল না। ১৮৫১ খৃঃ পর্যন্ত খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৯১৮ খৃঃ যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটি একটি পাহাড়ী এলাকা। এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এড্রিয়াটিক সাগরের তীরে অবস্থিত। মন্টেনেগ্রোর উত্তর-পশ্চিমে বসনিয়া-হারজোগোভিনা, উত্তর-পূর্বে সার্বিয়া

এবং দক্ষিণ–পূর্বে হচ্ছে আলবেনিয়া। আয়তন হলো ১৩ হাজার ৮১২ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা হচ্ছে ৬ লাখ ১৫ হাজার। এর মধ্যে মন্টেগ্রিয়ান ৬১·৮٪, স্লাভ মুসলিম ১৪·৬٪, সার্ব ৯·৩٪, আলবেনিয়ান মুসলিম ৬·৬٪ এবং অন্যান্য হচ্ছে, ৭·৯٪। এখানে প্রায় ২ লাখ মুসলমান বাস করে।

মন্টেনেগ্রোর রাজ্য সভার সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১২৫ জন। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১·	কম্যুনিস্ট কোয়ালিশন ফ্রন্টঃ	৮৩
২·	ডানপন্থী ফেডারেল সংস্কার ফেডারেশনঃ	১৭
৩·	আলবেনিয়া সমর্থিত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন ফ্রন্টঃ	১৩
৪·	জাতীয় দলঃ	১২

কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মোমির পোলাতোভিককে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে।

১৯৯২ সালে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোকে নিয়ে নতুন যুগোশ্লাভ ফেডারেশন গঠিত হয়েছে।

৩. ক্রোশিয়া

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ক্রোট সম্প্রদায়ের লোকেরা বাইর থেকে ক্রোশিয়ার হিজরত করে আসে। তখন তাদেরকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ১৯০১ সালে ক্রোশিয়া বুলগেরিয়ার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত বুলগেরিয়ার অধীন থাকে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রোশিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে। ১৯৪৫ সালে তা যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ক্রোশিয়ার উত্তরে স্লভেনিয়া ও হাঙ্গেরী এবং পূর্বে সার্বিয়া। এড্রিয়াটিক সাগরের বিরাট উপকূল ক্রোশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সেখানে কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দর আছে। আয়তন হচ্ছে, ৫৬, ৫৩৮ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪৭ লক্ষ। এর মধ্যে ক্রোট হচ্ছে, ৭৭·৯٪, সার্ব ১২·২٪ এবং অন্যান্য হচ্ছে ৯·৯٪।

ক্রোশীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫ জন। পার্লামেন্টকে 'সাবুর' বলা হয়। এটি তিন কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপঃ

১·	ক্রোশীয় ডেমোক্র্যাট দল	২৫০আসন
২·	সাবেক ডেমোক্রাট দল	৭৫ আসন
৩·	অন্যান্য দল	৮৫আসন

পার্লামেন্ট ১৯৯০ সালে তুদম্যান ফ্রাঙ্গোকে ক্রোশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯১ সালে ম্যানুলিক জোসিককে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। ১৯৯১ সালের ২১ শে ডিসেম্বর নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং ক্রোশিয়াকে যুগোশ্লাভ ফেডারেশন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৫শে জুন ক্রোশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ক্রোশিয়ার সার্ব সম্প্রদায়ের ৬ লাখ লোকের অধিকাংশ স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। ক্রোশীয় বাহিনীর সাথে যুগোশ্লাভ সার্ব ফেডারেল বাহিনীর কয়েক মাস যুদ্ধ হয়। ১৯৯২ সালে নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। যুদ্ধের কয়েক মাসে সার্ব ফেডারেল বাহিনী ক্রোশিয়ার এক তৃতীয়াংশ জবর দখল করে নেয়। সার্ব সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত ক্রোশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়। ক্রোশিয়াকে ইউরোপীয় জোট স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪. স্লভেনিয়া

স্লভেনিয়ান সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম স্লভেনিয়ায় বসবাস শুরু করে। ১৬৮৩–১৬৯৯ খৃঃ–এর যুদ্ধে স্লভেনিয়ায় তুর্কী ওসমানী শাসনের পতন ঘটে। জার্মানী স্লভেনিয়ার উপর আগ্রাসন চালায় ও স্লভেনিয়াকে জবর দখল করে নেয়। পরবর্তী পর্যায়ে তা অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শাসনাধীনে আসে। স্লভেনিয়া ১৯১৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ সালে যুগোশ্লাভ ফেডারেশনে যোগ দেয়। ১৯৮৯ সালে স্লভেনিয়ান পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্রে কিছু সংশোধনী আনে এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার অধিকার দান করে। ১৯৯০ সালের ২রা জুলাই, স্লভেনিয়ান পার্লামেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীনতার পক্ষে ১৮৭ ও বিপক্ষে মাত্র ৩ ভোট পড়ে। ১৯৯০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালের ২৫ শে জুন স্লভেনিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে যুগোশ্লাভ ফেডারেশন থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। ফলে যুগোশ্লাভ ফেডারেল বাহিনীর সাথে ১০ দিন যুদ্ধ হয়। ১৮ই জুলাই ফেডারেল বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। এর পর স্লভেনিয়াকে আর কোন ক্ষয়–ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

এরপর স্লভেনিয়া ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা পরিষদ এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

স্লভেনিয়ার উত্তরে অস্ট্রিয়া, উত্তর–পূর্বে হাঙ্গেরী, দক্ষিণ পূর্বে –ক্রোশিয়া এবং পশ্চিমে রয়েছে ইটালী। স্লভেনিয়ার আয়তন ২০, ২৫১ বর্গ কিলোমিটার। স্লভেনিয়ার তারসিট শহরের দক্ষিণ–পশ্চিমে রয়েছে একটি ছোট সমুদ্র উপকূল। ১৯৮৮ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী লোক সংখ্যা ১৯ লাখ।

স্লভেনিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন। এটি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে ৬ দলের সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক পার্টি ইউনিয়ন 'দিমুস' ৫৫% ভোট লাভ করে এবং সাবেক কম্যুনিস্ট পার্টি (ডেমোক্রাট সংস্কার পার্টি) লাভ

করে ১৮% ভোট। পার্লামেন্ট মিলান কুতসানকে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর সেখানে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫. মাকদুনিয়া

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্লভেনিয়ান সম্প্রদায় মাকদুনিয়ায় বসতি স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে তারা মাকদু-বুলগেরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পরে ১০১৪ সালে বাইজানটাইন সম্রাট মাকদু-বুলগেরিয়া দখল করে। ১৪শ শতাব্দীতে, সার্বিয়ার হাতে বাইজানটাইন শাসনের অবসান ঘটে। ১৩৫৫ খৃঃ তা তুরস্কের ওসমানী সুলতানের অধীনে আসে ও তুর্কী মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ১৯১২-১৯১৩ সালে অনুষ্ঠিত বলকান যুদ্ধের পর সেখানে তুর্কী মুসলিম শাসনের অবসান হয়। সার্বিয়া মাকদুনিয়ার বেশীর ভাগ এলাকা দখল করে এবং অবশিষ্ট এলাকা বুলগেরিয়া ও গ্রীসের অধীন চলে যায়। ১৯১৮ সালে যুগাশ্লাভিয়া মাকদুনিয়াকে যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে এবং তখন থেকে তাকে দক্ষিণ সার্বিয়া নামকরণ করা হয়। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত মাকদুনিয়া নাম ধারণ করেই বহাল থাকে।

মাকদুনিয়ার উত্তরে সার্বিয়া ও কসোভো, পূর্বে বুলগেরিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে আলবেনিয়া। আয়তন ২৫,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২০ লাখ। শতকরা ৬০ভাগ মুসলমান, মূল জনসংখ্যার ৬৪·৪% হচ্ছে মাকদুনিয়ান সম্প্রদায়, ২১% হচ্ছে আলবেনিয়ান, ৪·৮% হচ্ছে তুর্কী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হচ্ছে ৯·৬%। মাকদুনিয়ার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কিরিগিলিগো রউফ।

যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব সম্প্রদায় মাকদুনিয়ার মুসলমানদেরকে উৎখাত করে তাকে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রোহী। সেজন্য সে জোর তৎপরতাও শুরু করে দিয়েছে। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মাকদুনিয়ান বাহিনীর সাথে আলবেনিয়ান সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ হয়েছে।

মাকদুনিয়া পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ১২০। মাকদুনিয়া ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোশ্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

মাকদুনিয়া যুগোশ্লাভিয়া দ্বারা শোষিত হওয়ায় তা একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৫ই আগস্ট রাশিয়া মাকদুনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গ্রীসের আপত্তির কারণে ইউরোপীয় জোট স্বীকৃতি দিচ্ছে না। গ্রীসের আপত্তি হলো, তার দক্ষিণাঞ্চলেয় প্রদেশের নামও মাকদুনিয়া। কাজেই মাকদুনিয়া নামে স্বীকৃতি পেলে তা গ্রীসের দক্ষিণাঞ্চলে সংকট সৃষ্টি করতে পারে এবং তারা বৃহত্তর মাকদুনিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। কেননা, মাকদুনিয়া আগে ছিল অবিভক্ত।

১৯৯২ সালের ১১ই ডিসেম্বর, মাকদুনিয়ান পার্লামেন্ট দেশের নাম পরিবর্তন করে 'স্কোপজী মাকদুনিয়া' নামকরণ করেছে। অপর দিকে, ১৯৯২ সালের ১লা ও ২রা

ডিসেম্বর, জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জরুরী ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন সদস্য দেশগুলোর প্রতি মাকদুনিয়াকে স্বীকৃতির দান এবং জাতিসংঘের সদস্যপদের জনস্য আহ্বান জানিয়েছে, ১৯৯২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ মাকদুনিয়ায় ৩৭জন সামরিক পর্যবেক্ষক ও ৭শ শান্তিরক্ষী পাঠানোর এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য হলো, সেখানে সার্ব আগ্রাসন ঠেকানো। অন্যথায় তা গোটা বলকান এলাকায় যুদ্ধের দাবানল জ্বালাতে পারে।

মাকদুনিয়ার ওলামা সম্প্রদায়ের প্রধান সোলায়মান আফেন্দী বলেছেন, মাকদুনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে, চলছে কঠোর ষড়যন্ত্র। সেখানে শুধু মুসলমানদের জন্য একটি আইন প্রবর্তন করে বলা হয়েছে, তাদের তিনের বেশী সন্তান হতে পারবে না, এর বেশী হলে তাদেরকে শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। কিন্তু খৃষ্টানসহ অন্যদের জন্য এই আইন প্রয়োজ্য নয়। সেখানে একটি মহিলা কমিটি গঠিত হয়েছে। যাদের কাজ হলো, মুসলিম মহিলাদেরকে গর্ভপাতের জন্য উৎসাহিত করা, [১]

৬.বসনিসয়া—হারজেগোভিনা

স্লাভেনিয়ান সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বসনিয়া-হারজেগোভিনার গোড়া পত্তন হয়। ১৪শ খৃঃ পর্যন্ত সেখানে আশায়েরী গোত্রের গোত্রীয় শাসন অব্যাহত থাকে। বসনাক সম্প্রদায় হচ্ছে সেখানকার বিখ্যাত সম্প্রদায়। তাদের নামানুসারে বসনিয়া নামকরণ করা হয়েছে। তুর্কী সুলতান মোহাম্মদ আল-ফাতেহ ১৪৬৩খৃঃ বসনিয়া- হারজোগোভিনা জয় করেন। ১ম শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামের সাম্য, স্বাধীনতা, সুবিচার ও শ্রেষ্টত্বে মুগ্ধ হয়ে বাসনাক সম্প্রদায়ের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বসনিয়া-হারজেগোভিনায় ৪শ বছর পর্যন্ত তুর্কী মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকে। সেই যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও বিদ্বেষ আজ পর্যন্ত সার্ব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তারা বসনিয়া থেকে মুসলমানদেরকে যে কোন মূল্যে ও সুযোগে উৎখাত করতে আগ্রহী। তাদের জাতীয় সঙ্গীতের অংশ বিশেষ হচ্ছেঃ

'মুসলমানের রক্ত পান করার জন্য আমি হবো প্রথম, কে আছ দ্বিতীয়?'

১৮৭৮ সালে বসনিয়া থেকে তুর্কী মুসলিম শাসনের অবসান হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যবাদ বসনিয়া-হারজেগোভিনা দখল করে। ১৯১৮ সালে যুগোশ্লাভ ফেডারেশন গঠনের সময় সবনিয়া-হারজেগোভিনাকে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন থেকেই সার্ব শাসকরা মুসলমানদের ঐতিহ্য ও মসজিদসহ সকল কাজের ক্ষতি সাধন শুরু করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। ১৯৪৫ সালে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম হওয়ার পর মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট জুলুম-নির্যাতন নেমে আসে।

কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসানের পর বসনিয়া-হারজেগোভিনা ১৯৯২ সালের ১লা মার্চ যুগোশ্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতার স্বপক্ষে অনুষ্ঠিত গণভোটে অধিকাংশ লোক ভোট দেয়। শুধু বসনিয়া-হারজেগোভিনার সংখ্যালঘু সার্ব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক ভোটদানে বিরত থাকে।। ১লা মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় জোট ও যুক্তরাষ্ট্র বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৯২ সালের মে মাসে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

বসনিয়া-হারজেগোভিনা একটি অবরুদ্ধ প্রজাতন্ত্র। এ দেশের কোন সমুদ্র বন্দর নেই। দেশের পশ্চিম-উত্তরে ক্রোশিয়া, পূর্বে সার্বিয়া ও দক্ষিণে মন্টেনেগ্রো। রাজধানী সারাজেভো। এটা নতুন নাম। ১৫ শতাব্দীতে ওসমানী শাসকরা একে 'সারায়ে বসনিয়া' বলতো।

আয়তন ১৯ হাজার ৭৪১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৫০ লাখের অধিক। মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ৫০%, সার্ব ৩১% ও ক্রোট ১৮% এবং অন্যরা হচ্ছে ১%।[২]

বসনিয়া-হারজেগোভিনার পার্লামেন্ট ২৪৭ আসন বিশিষ্ট। এদের মধ্যে ৭জন সদস্যকে মনোনয়ন দেয়া হয়। ১৯৯০ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপঃ

১·	ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলন	৮৬ আসন
২·	সার্ব ডেমোক্র্যাট পার্টি	৭০ ,,
৩·	ক্রোশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন	৪৫ ,,
৪·	অন্যান্য সম্প্রদায় ও দল পেয়েছে	৩৯ ,,

ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট আলী ইজ্জত বেগভিটসকে দেশের প্রেসিডেন্ট, সালেম সাবিতসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ক্রোশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফেডাশেনের নেতা জিত্তরলিভিয়ানকে প্রধানমন্ত্রী, আরো ৪ জন ক্রোশিয়ান মন্ত্রী এবং দুইজন সার্ব মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। পার্লামেন্টের স্পীকার সার্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বসনিয়া-হারাজেগোভিনার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে ক্রোশিয়া, পূর্বে সার্বিয়া এবং পূর্ব-দক্ষিণে মন্টোনেগ্রো। বসনিয়া একটি প্রদেশ এবং হারজেগোভিনা আরেকটি প্রদেশ। সারাজেভো বসনিয়ার এবং মোস্তার হারজেগোভিনার রাজধানী। দেশের রাজধানী হচ্ছে, সারাজেভো।[৩]

বসনিয়া-হারজেগোভিনা যুগোশ্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর যখন ইউরোপীয় জোট এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে তখন থেকেই যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরোধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে সামষ্টিক উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বসনিয়া-

হারজেগোভিনার অভ্যন্তরে দেড়লাখ সদস্য বিশিষ্ট সার্ব মিলিশিয়া তৈরি করে। সংখ্যালঘু সার্ব সম্প্রদায় বসনিয়া-হারজেগোভিনার ভেতর সার্ব প্রজাতন্ত্র কায়েম করে তাকে সার্বিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। বসনিয়ার সার্ব নেতার নাম হচ্ছে রাদুভান কারাজিতস। অপরদিকে সার্ব শাসিত যুগোশ্লাভিয়া বৃহত্তর সার্বিয়া কায়েমের উদ্দেশ্যে বসনিয়া-হারজেগোভিনা দখল করতে চায়।

বর্তমানে সার্ব বাহিনী বসনিয়া-হারজেগোভিনার ৭০ ভাগ ভূমি দখল করে নিয়েছে। ক্রোটদের দখলে আছে ২৫ ভাগ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ভাগে রয়েছে মাত্র ৫ ভাগ। বসনিয়ার ক্রোট নেতার নাম হচ্ছে, মাথি বুবান।

বসনিয়া-হারজেগোভিসার ক্রোটরা প্রধানত দুই ধরনের চিন্তা করে। চরমপন্থী খৃষ্টান ক্রোটরা বসনিয়া-হারজেগোভিনায় পৃথক ক্রোট ও সার্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তাতে মুসলমানদের কোন স্থান নেই। তাদের সংখ্যা অল্প। তারাই সার্ব বাহিনী সাথে মাঝে-মধ্যে সমঝোতা ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রোট সম্প্রদায়ের মতে, বসনিয়া-হারজেগোভিনা হবে গণতান্ত্রিক দেশ এবং সার্বভৌম জাতিসমূহের ফেডারেশন। এতে তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করবে।

কিন্তু বসনিসয়ান সরকার যুদ্ধরত সার্ব বাহিনীর চাপে শেষ পর্যন্ত বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে কয়েকটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন, এগুলো স্বাধীন হবে না, বরং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকার বর্ণের ভিত্তিতে কোন অঞ্চল বা এলাকা গঠন করতে রাজী নেই। ইউরোপীয় জোট বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে ১০টি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে।

ইউরোপীয় জোট বসনিয়া-হারজেগোভিনার যুদ্ধ বন্ধ ও সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘও এক সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে জেনেভা শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে ইউরোপীয় জোট ও জাতিসংঘের দুইজন যৌথ প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। সার্ব বাহিনী এযাবত ১৮ বার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম উচ্ছেদ ও নিধন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় জোটের ধীর চল নীতির কারণে মুসলমানরা বাস্তুহারা হয়েছে আর সার্ব খৃষ্টানরা বসনিয়া-হারজেগোভিনার পুরো এলাকা দখল করে নিচ্ছে।

ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, ইউরোপীয় খৃষ্টানরা ইউরোপের বুকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে আগ্রহী নয়। তারা ইউরোপে আরেকটি আফগানিস্তান বা তথাকথিত মৌলবাদী রাষ্ট্রের উত্থান মেনে নিতে চাচ্ছে না। তাই জাতিসংঘের খৃষ্টান কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় জোটের খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ 'ধরি মাছ না ছুই পানি' এই নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে সার্ব বাহিনীর পক্ষে আকাংখিত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। আর মুসলমানরা তাদের বাড়ীঘর সব হারাচ্ছে।

যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, যুগোশ্লাভিয়ায় ৩টি অঞ্চল আছে। ২টি স্বায়ত্তশাসিত এবং একটি অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এর মধ্যে কসভো ও সঞ্জক হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। সার্ব সরকার ও সেনাবহিনী সে সকল অঞ্চলে নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে। কেননা, সেই অঞ্চলগুলো সার্বিয়ার সাথে আর থাকতে চাচ্ছে না, তারা স্বাধীনতা চায়। এখন আমরা সেই অঞ্চলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. কসোভোঃ

কসোভো সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে। ১৯৮৯ খৃঃ কসোভো পার্লামেন্ট কসভোর শাসনতন্ত্রের কিছু ধারা সংশোধন করেছে। পাশাপাশি সার্ব নিয়ন্ত্রিত যুগোশ্লাভ পার্লামেন্টও দেশের শাসনতন্ত্রের কিছু ধারা সংশোধন করেছে। এর পর থেকে যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব সরকারের সাথে কসোভো সরকারের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কসোভোর মুসলিম নেতার নাম হচ্ছে, ডঃ ইবরাহীম রোগুনা।

কসোভো আগে আলবেনিয়ার একটি অঞ্চল ছিল। কিন্তু ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়া জোর করে তা দখল করে। উভয় পক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করায় কসোভোর স্বায়ত্তশাসন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৯০ খৃঃ এ নিয়ে বিশৃংখলা দেখা দেয় ও সংঘর্ষ বাধে। ১৩০ আসন বিশিষ্ট কসোভো পার্লামেন্টের ১১৪ জন মুসলিম সদস্য ১৯৯০ সালে কসোভের স্বাধীনতার পক্ষে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব পার্লামেন্ট কসোভো পার্লামেন্টের ঐ সিদ্ধান্তকে বেআইনী ঘোষণা করে বলে যে, কসোভো পার্লামেন্টের ঐ প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার নেই। যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব পার্লামেন্ট কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে তাকে সরাসরি সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সেখানে সরাসরি সার্ব শাসন চালু করে।

কসোভোর আয়তন ১০হাজার ৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী প্রিস্টিনা। লোকসংখ্যা প্রায় দুই লাখ। দেশটি প্রায় লেবাবনের মত বড়। সার্বিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণে আজ কসোভোতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেখানে ২য় বৃহত্তম হত্যাকান্ড সংঘটিত করার জন্য ব্যাপক সার্ব সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। তারা কসোভোর ২২টি শহরে অবস্থান নিয়েছে এবং উঁচু ভবনসমূহের উপর পাহারা দিচ্ছে। সার্ব পুলিশ কসোভো পার্লামেন্ট ভবন ঘিরে রেখেছে এবং তা পাহারা দিচ্ছে।

সার্বিয়া পুরো কসোভোকে নিজ অঞ্চল বলে গ্রাস করতে চায়। আজ সেখানে বসনিয়ার মত সীমান্ত সমস্যা নয় বরং অস্তিত্বের সমস্যা দেখা দিয়েছে। কসোভো

স্বাধীন থাকার চেষ্টা করুক বা সার্বিয়ার অধীন থাকুক, উভয় অবস্থাতেই তাকে চরম মূল্য দিতে হবে। বিশ্ব বসনিয়া–হারজেগিভিনা এবং মাকদুনিয়ার ব্যাপারে কিছু সাড়া দিলেও কসোভোর ব্যাপারে এখনও তেমন বেশী সাড়া প্রদর্শণ করেনি।

কসোভোতে রাজবন্দীর সংখ্যা ১২ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ৮০ হাজার কসোভোর কর্মচারীর ভাগ্যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার আলবেনিয়ান বংশোদ্ভুত মুসলিম ছাত্রের লেখা–পড়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

১৯৮৯ খৃঃ সার্বিয়ার সর্বশেষ শাসক লাসারের লাশ কবর থেকে তুলে কফিনে মিছিল করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, কসোভো সার্বিয়ার অংশ। তাই সেখানে সার্বিয়ার ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে, কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানরা আজ সার্ব শেটানিকদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাদেরকে টিকে থাকতেহবে।

কসোভোর শুদ্ধ নাম হচ্ছে, কোস্‌মত। আলবেনিয়ান ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, মুক্তা। তাই এই মুক্তা নিয়ে আজ মুসলিম খৃষ্টান সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। মুসলমানদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইনশাআল্লাহ। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ আলবেনিয়ান বংশোদ্ভুত, অন্যরা হচ্ছে সার্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব সরকার সেখানে ২৯ হাজার সার্ব বাহিনী পাঠিয়ে মুসলিম গণজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে চাচ্ছে। তাই আজ সেখানে চলছে চরম উত্তেজনা। সার্ব প্রশাসন মুসলিম ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য স্কুল–কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে। দীর্ঘদিন যুগোশ্লাভিয়ার শোষণ ও অবহেলার কারণে কসোভোর অর্থনৈতিক অবস্থাখুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আলবেনিয়া ও তুরস্ক কসোভোর প্রতি সমর্থন জনানোর কারণে গোটা বলকান এলাকায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আলবেনিয়া ও তুরস্ক হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে যে, কসোভোতে যুগোশ্লাভিয়া যুদ্ধ শুরু করলে তারা চুপচাপ বসে থকবে না। সার্ব সরকার কসোভো থেকে মুসলমানদেরকে সার্বিয়ায় বহিষ্কার শুরু করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করা।

২. ভজভোদিনা

এটিও সারবিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। হঙ্গেরীর সাথে এর সীমান্ত রয়েছে। এর আয়তন ২১ হাজার ৫০৬ বর্গকিলোমিটার। রাজধানী হচ্ছে নভীসাদ। জনসংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজর ৭৭২। হাঙ্গেরীয়ান হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। সেখানেও সার্ব সরকার হাঙ্গেরীয়ান সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সার্বিয়ায় বহিষ্কার করা শুরু করেছে। হাঙ্গেরী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সে ভজভোদিনায় সার্ব নির্যাতন সহ্য করবে না। হাঙ্গেরী সুযোগের অপেক্ষায় আছে। যে কোন সময় সে ভজভোদিনাকে কেন্দ্র করে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ভজভোদিনার স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে।

যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব শাসকরা আজ উম্মাদের মত অন্যদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠর জন্য আদাপানি খেয়ে বলগেছে। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলনকে কতদিন পর্যন্ত দমন করে রাখা যাবে?

৩. সঞ্জক

সঞ্জক সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের অধীন একটি অঞ্চল। সঞ্জক সম্পর্কে সেখানকর মুসলিম নেতা ডঃ সোলায়মান মুরাদ ওগলাবিটস জেদ্দা থেকে প্রকাশিত আল মুসলিমুন পত্রিকার জাগরেব প্রতিনিধি ফাররাজ ইসমাইলের সাথে সাক্ষাতকারে বলেনঃ[৪]

আগামীতে সঞ্জক সার্ব বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। এ অঞ্চলে বসনিয়া-হারজেগোভিনার অনুরূপ নির্যাতন ও হত্যাকান্ড চালানো হবে। সার্বিয়া এটাকে নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। সে এটাকে নিজের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বাইরের হস্তক্ষেপকে পরোয়া করবে না।

ডঃ সোলায়মান বলেন, সঞ্জককে সার্ববাহিনী নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে। তারা ঘরে ঘরে অব্যাহত তল্লাশী চালাচ্ছে এবং সঞ্জকের জনগণকে সঞ্জকের বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছে। তাদের ধারণা, নয়তো তারা বসনিয়া-হারজেগোভিনায় গিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেবে। সঞ্জকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

ডঃ সোলায়মান সঞ্জকের গণতান্ত্রিক শ্রমিক দলের প্রেসিডেন্ট। তিনি ইতিপূর্বে অবিভক্ত যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া-হারজোগোভিনার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আলী ইজ্জত বেভিটাসের নেতৃত্বে গঠিত ইসলামী ডেমোক্রাটিক দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি সঞ্জকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। তাঁর সরকারের ১৩ জন মন্ত্রী আছেন।

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সঞ্জক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বায়ত্বশাসিত ছিল। এর রাজধানী 'নওবী বাজার।' নওবীবাজার অর্থ নতুন বাজার। সঞ্জকের উত্তর-পশ্চিমে সার্বিয়া ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্টেনেগ্রা, দক্ষিণে আলবেনিয়া ও দক্ষিণ-পূর্বে কসোভো। বার্লিন সম্মেলন ও কনস্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী সঞ্জকের বর্তমান সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছে। ১৫ শ শতাব্দীতে তুর্কী শাসনামলে সঞ্জকের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা ওসমানী সাম্রাজ্যের অবসানের আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর সাঞ্জকবাসীদের উপর সার্ব খৃষ্টান অর্থডক্স শাসন বহাল থাক সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের দীন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে আছে।

সঞ্জক ও বসনিয়ার জনগণ মূলত বাসনাক সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু সার্ব সম্প্রদায় ঐ দুই এলাকার মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে। সার্ব সম্প্রদায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সঞ্জককে সর্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সঞ্জকবাসীদেরকে

তাদের দীন, মানবিক ও জাতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। বর্তমানে, সঞ্জকের স্বায়ত্তশাসননেই।

সঞ্জকের আয়তন হচ্ছে, ৮হাজার ৬৮৭ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ ৪০ হাজার। এর মধ্যে মুসলমান হচ্ছে, ২ লাখ ৫৩ হাজার। সার্ব, মন্টেনেগ্রোনিয়ানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা হচ্ছে, ১ লাখ ৮৭ হাজার।

ডঃ সোলায়মান বলেন, এটা হচ্ছে সার্ব সরকারের পরিসংখ্যান। বাস্তবে মুসলমানের সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে। সার্ব সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঐ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। সঞ্জকে 'ইসলামী যুব সংগঠনের প্রধান হচ্ছেন, আমর ভিটস নোসরত, ইসলামী সাংস্কৃতিক পূনর্জাগরণ সংস্থার সভাপতি হচ্ছেন তানদীর ভিটস এসমত এবং 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'মারহামাতের' প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, কোজিহ মোরিতস।

ডঃ সোলায়মান আরো বলেন, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর ভেনিস চুক্তি মোতাবেক সর্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো সাঞ্জককে বিভক্ত করে। কিন্তু ১৮৭৯ সালে কনস্টোন্টিনোপল চুক্তি দ্বারা তা সংশোধন করা হয়। ঐ চুক্তিতে বলা হয় যে, সঞ্জক ওসমানী খেলাফতের অধীন একটি অবিভাজ্য স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল। কিন্তু ১৯১৩ সালে পুনরায় সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো বেলগ্রেড চুক্তি অনুযায়ী সঞ্জককে দ্বিখন্ডিত করে। সঞ্জক এখন তার হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং স্বায়ত্ত শাসন অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সঞ্জককে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করাও সাঞ্জকবাসীদের অন্যতম লক্ষ্য। ডঃ সোলায়মান আরো বলেন, সঞ্জকের ইসলামী পুনর্জাগরণ দেখে সার্ব সম্প্রদায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা এখন তা দমন করতে চাচ্ছে।

সঞ্জকের মুসলিম অধিবাসীরা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সার্ব সম্প্রদায়ের করুণ নির্যাতন ভোগ করে। তারা হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। বর্তমানেও সার্ব এবং মন্টেনেগ্রো সম্প্রদায় সঞ্জকের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামষ্টিক উচ্ছেদের হুমকি সৃষ্টি করেছে। সর্বিয়া ও মন্টেনেগ্রেরা সঞ্জককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তারা এখন সেকারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাদেরকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তারা প্রথম থেকেই সেখানে মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রখেছে।

সার্ব সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রদেরকে কোণঠাসা করার জন্য অম্ভব শর্তাবলী আরোপ করে। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মুসলমান ছাত্রদেরকে ভর্তি করার বিষয়ে কোন কড়াকড়ি করে না। উদ্দেশ্য হলো, উচ্চ শিক্ষা থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়কে বঞ্চিত করা।

সার্ব সরকার অর্থনৈতিক দিক থেকে সঞ্জককে সম্পূর্ণ অনুন্নত রেখেছে। ফলে সঞ্জক সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাদেরকে চাকরি ও কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, যদিও তারা ঐ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক। অনেককে তুরস্কসহ অন্যান্য দেশে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। সঞ্জকের বহু লোক হিজরত করে বাইরে চলে গেছে।

১৯৯২ সালের প্রথম দিকে সঞ্চকের মুসলমানরা সার্ব সরকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে গোপনে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে গণভোট অনুষ্ঠান করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু সার্ব সরকার ঐ গণভোটকে বেআইনী ঘোষণা করেছে।

সঞ্জকের অধিবাসীরা মুসলিম বিশ্বসহ বিশ্বসমাজের প্রতি স্বায়ত্তশাসনের জন্য সার্ব সরকারের উপর চাপ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়াও তারা নওবীবাজারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি বালক স্কুল, একটি বালিকা স্কুল, নতুন মসজিদ নির্মাণ, পুরাতম ২০টি মসজিদের মেরামত, একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং খাদ্য ও ওষুধ সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়

যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলাম

যুগোশ্লাভিয়াতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান। অর্থাৎ মুসলামানের সংখ্যা ৬০ লাখের উপর। যুগোশ্লাভিয়ায় এত বিপুল পরিমাণ মুসলমানের ইতিহাস কি তা আমাদের জানা দরকার।

যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলামের আগমনের ব্যাপারে ৪টি মত রয়েছে। এক মতে, আরব মুসলমানরা সকাল্লিয়া দ্বীপ দখলের পর যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটে। ২য় মত অনুযায়ী, ইটালীর ভেনিস শহরের পথে আরব ব্যবসায়ীদের দ্বারা যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলাম এসেছে। ৩য় মত হচ্ছে, ৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে বোলভা অঞ্চল থেকে সর্বপ্রথম যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটে। সেখানকার বাসানেকা সম্প্রদায়ের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা পরে যুগোশ্লাভিয়ায় এসে বসবাস শুরু করে তার পাহাড়ী এলাকায় বাস করতে থাকে এবং নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের এই রাষ্ট্রের বিষয়ে ক্যাথলিক ক্রোশিয়ান সরকার ও গোড়া সার্ব খৃষ্টান সরকারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে, বাসানেকা সম্প্রদায়ের কিছু লোক খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করে এবং একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানদের সাথে রক্ত সম্পর্কের কারণে খৃষ্টান গীর্জা ইসলাম দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। ১২শ খৃঃ মোতাবেক ৬শ হিজরীতে, হাঙ্গেরী বাসনেকা রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালায় ও তা জয় করে নেয়। কিন্তু হাঙ্গেরীর শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্প কিছু দিন পর বাসানেকা সম্প্রদায়ে লোকেরা পুনারায় নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

৪র্শ মত অনুযায়ী, তুরস্কের ওসমানী শাসনের সাথে যুগোশ্লোভিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটেছে ১৫শ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯শ হিজরী শতাব্দীতে। তুর্কী ওসমানী শাসনামলে বাসানেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। বলকান অঞ্চলে তুর্কী বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামের প্রসার হতে থাকে। তুর্কী বাহিনী এজিয়ান সাগর অতিক্রম করে গ্রীক সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করেন এবং গালিপলি অঞ্চল দখল করেন। ১৩৬২খৃঃ তাদের হাতে আদিরনা নামক অন্য আরেকটি অঞ্চরের পতন হয়। তারা মাতিজা নদীর তীরে অবস্থিত শেরভনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৩৭১খৃঃ পুনরায় সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী তুর্কি মুসলিম বহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করে। সেখান থেকে তারা বুলগেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা তারাকিয়া ও উগলুতে ছড়িয়ে পড়েন। ১৩৮৬ খৃঃ তারা বুলগেরিয়ার রাজধানী সুফিয়া দখল করে, পরে নিশ শহর পর্যন্ত পৌঁছে যান। সার্ব বাহিনী সম্মিলিত বলকান বাহিনী নিয়ে তুর্কী বাহিনীর মোকাবিলা করে, এবং ১৩৮৯ খৃঃ কসোভোর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। ওসমানী

শাসকরা ১৪৫২ খৃঃ বেলগ্রেড পৌঁছেন। এর মাধ্যমে বলকান উপদ্বীপ যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

যুগোশ্লাভিয়ায় ইসলামের প্রসারে যে উপাদানটি সবচাইতে বেশী সহায়ক হয়েছিল সেটি ছিল 'ইয়োগোমিলি খৃষ্টান ধর্মমত' কিংবা বাসানিক গীর্জার আবির্ভাব। এই নতুন খৃষ্টান ধর্মমত যুগোশ্লভিয়ায় বিদ্যমান রোমান ক্যাথলিক ও অর্থডক্স ধর্মমতের বিরোধিতা করে এবং সেগুলোর বিভিন্ন বিশ্বাসের সংশোধন দাবী করে। নতুন ধর্মমত অনুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আগমন ঘটবে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে ত্রিত্ববাদের বিরোধী এবং আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পাদ্রীদের মধ্যস্থতাসহ আত্মার সাথে বাস্তব পার্থক্যকে অস্বীকার করেন। পুরাতন ধর্ম মতের সাথে নতুন ধর্মমতের-সংঘাতের কারণে বাসনাকরা (বসনিয়ার অধিবাসী) ইসলাম কবুলের জন্য প্রস্তুত হয়।

তিন খৃষ্টান ধর্মমতের সংঘাতের কারণে বসনিয়ার বাসনায়ক সম্প্রদায় তুর্কী সুলতানের সাহায্য কামনা করে। ফলে, বিশ্ব বিজয়ী তুর্কী বীর সুলতান মোহাম্মদ আল-ফাতেহ ১৪৬৩ খৃঃ মোতাবেক ৮৭৮ হিজরীতে, বসনিয়াসহ যুগোশ্লাভিয়ার বিরাট অংশ জয় করেন এবং সেখানে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করেন। তার পরে দীর্ঘ চার শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে মুসলিম শাসন অব্যহত থাকে।

বাসনাক সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের নিকটতর হতে থাকে ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। কেননা, ইসলামী মতাদর্শ তাদের ধর্মমতের কাছাকাছি ছিল। অপরদিকে তারা ইসলামী আদর্শের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাধীনতা, ইনসাফ, সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধ দেখে আকৃষ্ট হয়। তাই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি মুসলিম শাসকদের ১ম শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতে বাসনাক সম্প্রদায়ের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ইউরোপের যুগোশ্লাভ অংশে ইসলামের বিরাট সাহায্যকারী শক্তিতে পরিণত হয়। তুর্কী ওসমানী রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়লে অস্টিয়া যুগোশ্লাভিয়র কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। ওসমানী শাসকরা ১৮৭৮ খৃঃ মোতাবেক ১২৯৫ হিজরীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের কাছে পরাজয় বরণ করে এবং বসনিয়া সার্বিয়া ও মন্টোনেগ্রো ত্যাগ করে চলে আসে।

যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানরা অস্টিয়া-হাঙ্গেরীয়ান শাসনাকালে বর্ণনাতীত নির্যাতন, হত্যা ও উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হয়। ফলে, বহু মুসলমানরা সেখান থেকে হিজরত করে ওসমানী সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান হিজরত কিংবা পালিয়ে যাওয়াকে সমস্যার সমাধান বিবেচনা করলেন না। তারা অস্টিয়ান-হাঙ্গেরীয়ান নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তাদের সাথে অস্টিয়া-হাঙ্গেরীর রোমান ক্যাথলিক শাসকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অর্থডক্স

খৃষ্টানরাও যোগ দেয়। ফলে মুসলমানগণ ধর্মীয় বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেন। কেননা, দীন ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

১ম বিশ্ব যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর পাজয়ের পর যুগোশ্লাভিয়ায় সার্ব রাষ্ট্র কায়েম হয়। মুসলমানরা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয়ান উপনিবেশ ও নির্যাতন থেকে বাঁচার আশায় সার্ব রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর পর অর্থডক্স সার্বরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের সাথে সকল ময়দানে রাজনৈতিক মোকাবিলা শুরু করে। তারা মুসলামানদের উপর করুণ নির্যাতন চালাতে থাকে।

একমাত্র বেলগ্রেড শহরেই ২৭০টি সমজিদ, কিছু বড় মাদ্রাসা এবং ২৭০টি প্রাথমিক মাদ্রাসা ছিল। সার্ব খৃষ্টানরা ঐ সকল সমজিদ-মাদ্রাসা ভেঙ্গে ফেলে এবং সেই স্থানে হোটেল ও রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে। বেলগ্রেড শহরের সবচাইতে বড় মসজিদ 'পাটারের স্থানে যুগোশ্লাভ পার্লামেন্ট ভবন তৈরী করা হয়েছে। ১৫২১ খৃঃ মোতাবেক ৮২৮ হিঃ সালে তৈরী বিরাকলী' মসজিদ বেলগ্রেডের সর্বাধিক প্রাচীন মসজিদ, যা এখন পর্যন্ত টিকে আছে। যুগোশ্লাভিয়া বিজয়ী তুর্কী সুলতান মোহাম্মদ আল-ফাতেহ কসোভোর প্রিজোনে যে মসজিদ তৈরী করেন, সেটিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

১৯১৯ খৃঃ বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানগণ নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ডঃ মোহাম্মদ সাবাদুর নেতৃত্বে একটি ইসলামী দল গঠন করে।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুগোশ্লাভিয়ায় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়া। ১৯৪৫ খৃঃ স্বৈরাচারী মার্শাল জোশেফ টিটো যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষমতা লাভের পর পুনরায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করে। সে মসজিদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গার দিকে মনোযোগ দেয়। কেনন, মুসলমানের জীবনে ঐ দু'টা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সর্বাধিক। সে প্রথমে জাগরেব মসজিদ বন্ধ করে এবং মসজিদের ইমামকে হত্যা করে মসজিদের দরজায় ঝুলিয়ে রাখে। এরপর মসজিদটিকে জাদুঘরে পরিণত করে এবং মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বহু মুসলমানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

১৯৭০-এর দশকে বিদেশে অবস্থানকারী যুগোশ্লাভ মুসলমানরা ধীরে ধীরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু করেন এবং সেখানে মুসলিম সমাজের ভাগ্যের পরিরবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী হন। তাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে সরকার কিছু মসজিদ ও মাদ্রাসা ফেরত দেয়। ১৯৭৩ খৃঃ মোতাবেক ১৩৯৩ হিঃ সালে যুগোশ্লাভ সরকার মুসলামরদের জন্যও পৃথক প্রজাতন্ত্র গঠনের সুযোগ দেয়। তখন বনিয়া-হারজেগোভিয়া নামক পৃথক মুসলিম প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়। তারপর তারা মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ শুরু করেন এবং দীনের দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন। তারা যুগোশ্লাভিয়ায় ২৭০০ মসজিদ তৈরী করেন। এছাড়াও কিছু মসজিদের সংস্কার ও মেরামত করেন। একমাত্র সারাজেভো অঞ্চলেই ১০৯২টি মসজিদ আছে। কাসোভোর প্রিস্টিনায় আছে ৬৭০টি

মসজিদ। মাকদুনিয়র রাজধানী স্কপজিতে আছে ৩৭২টি এবং মন্টেনেগ্রোর রাজধানী টিটোগ্রাডে আছে ৭৬টি মসজিদ। অন্যান্য মসজিদ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত।

বিরাট সংখ্যক মসজিদ তৈরির কারণে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্টে সরকারের অভিযোগ ছিল, মুসলমানের সংখ্যার তুলনায় মসজিদ অনেক বেশী। তাদের আশংকা, এর ফলে দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। তাদের আরও অভিযোগ হলো, অধিকাংশ মজজিদ নাকি সরকারের বিনা অনুমতিতে তৈরি করা হয়েছে; যা বেআইনী। এ আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট শাসন বিদায় নিয়েছে এবং মসজিদগুলো টিকে আছে।

১৯৮৭ খৃঃ পুনরায় জাগরেব মসজিদ খোলা হয় ও সেখান থেকে জাদুঘর সরিয়ে ফেলা হয়। কম্যুনিস্ট সরকার ও খৃষ্টানদের যোগসাজশে উদ্বোধনের আগে মসজিদে অগ্নি সংযোগ করা হয়। তারপরও মসজিদটি খোলা হয়।

কম্যুনিস্ট শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন বিতরণ নিষিদ্ধ ছিল। কোরআন চর্চার প্রসার বন্ধ করার জন্যই ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিদেশ থেকে আগত মুসলিম ছাত্রদের জন্য ১কপির বেশী কোরআন সাথে আনা নিষিদ্ধ ছিল। তাও আবার শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে লিপিবদ্ধ করে প্রত্যাবর্তনের সময় ফেরত নেয়া বাধ্যতামূলকছিল।

মুসলিম প্রধান এলাকাসমুহ

যুগোশ্লাভিয়ায় ৬০লাখের অধিক মুসলমানের মধ্যে বসনাক ও হারজেগোভিনা সম্প্রদায়ের লোক অর্ধেক। বাঁকীরা হচ্ছে, মাকদুনিয়ান, আলবেনিয়ান, তুর্কী, গাজার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। যে সকল এলাকায় মুসলমানদের বাস বেশী সেগুলো হচ্ছে, বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মাকদুনিয়া, কসোভো, সঞ্জক, ক্রোশিয়া ও স্লভেনিয়া।

বসনিয়া-হারজেগোভিনার ৩০ লাখ মুসলামানে তদারকীর জন্য সারাজেভোতে সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদের কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপন করা হয়েছে।

সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের ১০ লাখেরও বেশী মুসলমানের তদারকীর জন্য কাসেভোর রাজধানী প্রিষ্টিনায় রয়েছে সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদের কেন্দ্রীয় দফতর। মন্টোনেগ্রো প্রজাতন্ত্রের প্রায় আড়াই লাখ মুসলামনের তদারকীর জন্য টিটোগ্রেডে রয়েছে, সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদের সদর দফতর।

অন্যান্য প্রজাতন্ত্রেও মুসলমানদের মসজিদসহ অন্যান্য ইসলামী সংস্থা রয়েছে। অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের তুলনায় বসনিয়ার মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহে পূর্বোল্লেখিত মসজিদ ব্যতীত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ইসলামী তৎপরতা আছে। সেগুলো হলঃ যুগোশ্লাভ ইসলামী ইউনিয়ন। যুগোশ্লাভিয়ায় বহু ওলামায়ে কেরাম আছেন। ডঃ ইয়াকুব সলিমভস্কি হচ্ছেন সেই যুগোশ্লাভ ইসলামী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও তিনি পূর্ব ইউরোপীয় ইসলামী পরিষদেরও সভাপতি। বসনিয়ার মুফতীর নাম হচ্ছে, ডঃ আহমদ সালেহ গোলাকোভিটস।

যুগোশ্লাভিয়ায় অনেক মাদ্রাসা আছে। ১৯৯১ সালে হাফেজী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ২০হাজার। একমাত্র সারাজেভো অঞ্চলে রয়েছে ৬শ প্রাথমিক মাদ্রাসা, প্রিস্টিনায় আছে ১২৫টি, স্কপজিতে ১৯টি, টিটোগ্রাডে ২টি প্রাথমিক মাদ্রসা আছে

এছাড়া ও সারাজেভো, প্রিস্টিনা ও অন্যান্য শহরে আরো কয়েকটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসা আছে। সারাজেভোতে আছে একটি ইসলামী কলেজ। এটি ১৩৯৭ হিজরীতে খোলা হয় এবং এতে একটি মহিলা বিভাগ আছে। কলেজে আলেম, ইমাম, শিক্ষক ও ওয়ায়েজীন তৈরী করা হয়। তারা ইউরোপের ঐ অংশে ইসলামের দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

সারাজেভোতে 'গাজী খসরু বেক' নামক একটি প্রাচীন ইসলামী লাইব্রেরী আছে। এতে পাঠকদের জন্য রয়েছে হাজার হাজার মূল্যবান ইসলামী বই। বইগুলো আরবী তুর্কী ও ফারসী ভাষায় লিখিত।

যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো করা হয়েছে তুর্কী ভাষা থেকে। এখন সরাসরি আরবী ভাষা থেকে কোরআনের অনুবাদের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে মদীনার বাদশাহ ফাহাদ কোরআন কমপ্লেক্স থেকে ঐ অনুবাদ প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানরা বিভিন্ন উপায়ে দ্বীনের দওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

যুগোশ্লাভ মুসলমানদের বাইরে হিজরত

যুগোশ্লাভিয়ায় তুর্কী শাসনের অবসানের পর ১৮৭৯ সাল থেকে মুসলমানরা তুরস্কসহ অন্যান্য দেশে নিজেদের দীন নিয়ে পালিয়ে যায়। অস্টিয়া-হাঙ্গেরীর খৃস্টান শাসকদের নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই তারা যুগোশ্লাভিয়া ত্যাগ করে।

পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক অস্টিয়ান-হাঙ্গেরী শাসকেরা বসনিয়ার মুসলমানেদের জায়গায় বিরাট সংখ্যক খৃস্টান ক্যাথালিক জনতাকে পুনর্বাসন করে। এর ফলে, সেখানকার মুসলমান ও অর্থডক্স খৃস্টানদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। তাই

কোন কোন এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং মুসলিম এলাকাগুলোসহ যুগোশ্লাভিয়ায় খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আলবেনিয়ার পর বসনিয়া-হাজেগোভিনা ইউরোপে ২য় মুসলিম রাষ্ট্র। এরপর মাকদুনিয়া হবে ৩য় মুসলিম রাষ্ট্র এবং কসোভো হবে ৪র্থ মুসলিম রাষ্ট্র ইনশাআল্লাহ। ইউরোপীয় খৃষ্টানসহ রাশিয়ান ও আমেরিকান খৃষ্টানরা এই বিষয়টাকেই সবচাইতে বেশী ভয় পায়। কেননা, তারা ইতিপূর্বে স্পেন থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একই কারণে উচ্ছেদ করেছিল।

উল্লেখ্য যে, সার্ব শাসকরা সর্বদা যুগোশ্লাভিয়ার মুসলামানদেরকে বাইরে হিজরত করার জন্য চেষ্টা চালায়। সার্ব সরকার ১৯৩৭ খৃঃ তুরস্কের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ৮০ লাখেরও বেশী যুগোশ্লাভ মুসলমানকে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়।[৫]

একমাত্র বসনিয়া-হারজেগোভিনা থেকেই ৪০লাখ মুসলমান তুরস্কে হিজরত করে। তাই স্বাধীনতা ঘোষণার পরপর বসনিয়া পার্লামেন্ট তুরস্কে হিজরতকারী ৪০লাখ বসনিয়ান মুসলমানকে ফেরত আনার প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে।

৫ম অধ্যায়

বসনিয়ার মুসলমানের বিরুদ্ধে সার্ব আগ্রাসনের কারণ

সার্ব সম্প্রদায় নিজেদেরকে যুগোশ্লাভিয়ার সর্বশ্রেষ্ট জাতি ও শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের অধিকারী মনে করে। তাদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। অবিভক্ত যুগোশ্লাভিয়ার সকল অস্ত্র ও অর্থ এবং নেতৃত্ব তাদের হাতেই। তাই তাদের ধারণা, তারাই যুগোশ্লাভিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্যরা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তারা সকল প্রজাতন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থ হয়েছে শুধু ক্রোশিয়া ও স্লভেনিয়ার ব্যাপারে। কেননা, ঐ দুটো দেশ সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সার্বিয়ার সার্থক মোকাবিলা করে টিকে গেছে। সর্বোপরি সার্ব সম্প্রদায়ের মত তারাও খৃষ্টান।

তারা এখন বাধ সেধেছে বসনিয়া- হারজেগোভিনায় মুসলমানদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। তারা বসনিয়ার মুসলমানদের স্বাধীনতাকে নস্যাত করার জন্য অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা সবনিয়া-হারজেগোভিনার দুই-তৃতীয়াংশ জবরদখল করে বৃহত্তর সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করতে চায়। তাদের আগ্রাসনের কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১· যুগোশ্লাভিয়ায় ওসমানী শাসনের বিরুদ্ধে পুরাতন ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ বিশেষ করে বাসনাক সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ অন্যতম কারণ। আর বসনিয়ার মুসলমানরা হচ্ছে বাসনাক সম্প্রদায়ের লোক।

২· রাজনৈতিক কারণঃ বসনিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হলে সার্ব সম্প্রাদায়ের লোকেরা সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করতে বাধ্য হবে। কেননা, তারা সেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩১ভাগ।

৩· অর্থনৈতিক কারণঃ বসনিয়া- হারজেগোভিনায় প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সার্বিয়া তা থেকে বঞ্চিত থাকতে চায় না।

৪· ধর্মীয় কারণঃ খৃষ্টানরা ইউরোপে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সহ্য করতে নারাজ। নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি আরোপ করায় বসনিয়ার সার্ব নেতা মন্তব্য করেন, আমরা যে মুহূর্তে ইউরোপের বুকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে নিয়োজিত আছি, ঠিক সে মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের শাস্তি গ্রহণযোগ্য নয়।[৬]

সার্ব তথ্য মন্ত্রী বিলিবোর উস্কুইতস বলেছেন,'আমরা ইউরোপকে ইসলাম থেকে রক্ষার জন্য নূতন ক্রুসেড যুদ্ধের পতাকা উড়িয়েছি। আমরা বিশ্বব্যাপী ইসলামের নিয়ন্ত্রণ

লাভের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। কেননা, বিশ্বব্যাপী খৃষ্টবাদ সংকুচিত হয়ে আসছে আর প্রত্যেক জায়গায় ইসলাম বেড়ে চলেছে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম ইউরোপের জন্য বিপদ। তাই সার্ব সম্প্রদায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলামানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজ করছে। কেননা, ইউরোপ এই কাজের জন্য সার্বিয়াকে উদ্বুদ্ধ করছে'।[৭]

খৃষ্টান ও ইহুদীদের মতে, মাসীহ পুনরায় দুনিয়ায় আসার জন্য ২টা জিনিস সংঘটিত হওয়া পূর্বশর্ত। ১, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ ধ্বংসকারী যুদ্ধ ও ২, বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম। মুসলামানরা আজ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ। তাই তাদেরকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই ঐ দুই সম্প্রদায়ের আকাংখা পূরণ হতে পারে। অথচ এগুলো হচ্ছে, তাদের মিথ্যা ও কাল্পনিক ধারণা।

বসনিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হাসান আসাবহিতস বলেছেন, ইউরোপীয়রা বসনিয়াকে ইউরোপের বুকে ক্যান্সার মনে করে। তাই এর মূলোৎপাদন প্রয়োজন। সেই মুলোৎপাটন সার্ব জাতিসহ যে কোন খৃষ্টানই করতে পারে।[৮]

সার্বিয়ান সরকারের কাছে বসনিয়ার আরেকটি কৌশলগত দিক হলো, এখানকার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিতে পারলে পরবর্তীতে যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোকে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হবে। কেননা, মাকদুনিয়া, কসোভো এবং সঞ্জক এর পরবর্তী তালিকায় আছে। তারাও যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।

সার্বিয়া ভুলে গেছে, যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমান ও সার্ব খৃষ্টানদের সংখ্যা সমান অর্থাৎ ৬০ লাখ। বরং মুসলমানের সংখ্যা ৬০ লাখেরও বেশী। এগুলো যুগোশ্লাভ সরকারের হিসেব। সমান সংখ্যক মুসলমানের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার নির্মুল অভিযান কিসের ইঙ্গিতে চলছে? বসনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট সালেম সাবিতস অভিযোগ করেছেন, খৃষ্টান ইউরোপের ইঙ্গিতেই সার্ব সম্প্রদায় মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে। অথচ, বাহ্যিকভাবে, তরা শান্তির কপোত উড়ানোর বুলি আওড়াচ্ছে। তারাই সেই জাতি যারা স্পেনে কয়েক লাখ মুসলমানের রক্তে নিজেদের হাত রঙ্গিন করেছে এবং জেরুজালেমে ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) আহ্বান জানিয়ে ৯০হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে। বিশ্রী অতীত, আর বর্তমানের ভদ্র চেহারা!

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সার্ব বাহিনীর করুণ নির্যাতন

সার্ব সম্প্রদায় বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানদের উপর যে লোমহর্ষক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে, তা কোন মানুষের পক্ষে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যা লিখতে কলম থমকে যায়, বিবেক স্থবির হয়ে আসে, ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং নির্যাতনের সকল ইতিহাস ম্লান হয়ে আসে।

ইউরোপীয় জোট এর নাম দিয়েছে বর্ণ উচ্ছেদ অভিযান। অর্থাৎ মুসলিম উচ্ছেদ অভিমান। সেই উচ্ছেদ অভিযানের মধ্যে রয়েছে হত্যা, বিতাড়ন, নারী নির্যাতন, ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস, মুসলমানদের বাড়ীঘর ও সহায় -সম্পদ জবরদখল ইত্যাদি। আজ বসনিয়ার মুসলমানগণ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের অনুরূপ উদ্বাস্তু জাতি হিসেবেবিবেচিতহচ্ছে।

এখন আমরা মুসলমানদের ওপর সার্ব অত্যাচারের কিছু অতীত রেকর্ড তুলে ধরছি। ১৯৪১-৪৫, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারা ১ লাখ ২০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। একমাত্র দ্রীনা নদীর দুই তীরে ৬০ হাজার মুসলমানকে জবেহ করে নদীতে ফেলে দেয়ায় নদীর পানি লাল আকার ধারণ করে। (১) আন্তর্জাতিক আদালতে এর কোন বিচার না হওয়ায় আজও তারা সেই হত্যা ও নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি করছে। এছাড়াও মুসলমানদের সম্পত্তি লুট, নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতনসহ অন্যান্য নির্যাতনের কোন শেষ নেই। ফলে, বহু মুসলমান নিজেদের ঈমান ও আকীদা এবং জান রক্ষার জন্য তুর্কী সুলতানাতের অধীন বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে হিজরত করে। ১৯৪২ সালে, বসনিয়ার বোত্সা শহরে সার্ব বাহিনীর অধিনাক ঐ শহরের মুফতীকে ধরে আনে এবং মসজিদের দিকে পিঠ দিয়ে দরজার চৌকাঠের উপর শুইয়ে পায়ের মধ্যে তারকাঁটা লাগিয়ে জবেহ করে এবং বলে, এটা আমাদের ঈদের প্রথম কুরবানী।

এখন আমরা বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানদের উপর বর্তমান সার্ব নির্যাতন সম্পর্কে আলোচনা করবো। [৯]

১. হত্যাকান্ড

সার্ব সম্প্রদায় ও সার্ব বাহিনী মুসলমানদেরকে উচ্ছেদের জন্য হত্যাকে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা শহর ও গ্রামে বাড়ীতে ঢুকে ঢুকে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে, কোন সময় একাকী এবং কোন সময় পাইকারী হত্যা করছে। বাড়ী বাড়ী আক্রমণের সময় তারা মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে মুসলিম পুরুষদের উলঙ্গ করে খতনা দেখার পর তাদেরকে হত্যো করে। এছাড়া যুদ্ধেও বহু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর তারা তাদের নাক-

কান কেটে ফেলে এবং চোখ উপড়িয়ে লাশ বিকৃত করে। কোন কোন সময় লাশের মধ্যে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় তাদেরকে হত্যা করে ছোরা গরম করে তা দিয়ে তাদের বুক ও কপালের গোশত কেটে খৃষ্টানদের ক্রুশ চিহ্ন অংকন করে লাশ ফেলে দেয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন লাশকে খৃষ্টান বানানো হলো। এছাড়া তারা গরম পানিতে সিদ্ধ করেও মুসলিম যুবকদেরকে হত্যা করে।

সৌদি আরবে গঠিত বসনিয়া–হারজোগোভিনা সাহায্য কমিটির সদস্য এবং রাবওয়াতে অবস্থিত প্রিন্স সুলতান মসজিদের ইমাম শেখ সালেহ আলী সোহাইল বসনিয়া সফর শেষে ফিরে এসে বলেন, সার্ব বাহিনী মুসলমানদেরকে হত্যা করার পর লাশ দিয়ে পশুখাদ্য তৈরির কারখানায় রাসায়নিক উপায়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে মিলিয়ে তা দিয়ে পশুখাদ্য তৈরি করে লাশের সদ্ব্যবহার (?) করছে এবং ঐ খাদ্য পশুকে খাওয়ানো হচ্ছে। [১০]

বসনিয়া থেকে ফিরে আসা একব্যক্তি প্রত্যাক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে সৌদি আরবের পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে ছিল যে, সার্ব সৈন্যরা একজন শিশুকে তার পিতার সামনে আগুনে পুড়ে পিতাকে পোড়া শিশুর গোশত খেতে বাধ্য করে এবং সবশেষে পিতাকেও গুলীকে করে হত্যা করে।

মক্কার বাদশাহ আবদুল আযীয মাসজিদের ইমাম শেখ নাসের আল–মাইমানী বলেছেন, সার্ব বাহিনীর অত্যাচার কল্পনাতীত ও সকল নির্যাতনের মানদন্ডের উর্ধে। এটাকে শুধু বর্বরতা ও করুণ নির্যাতন না বলে অন্য কিছু বলতে হবে। সার্ব বাহিনী মুসলিস নারী ও শিশুদেরকে জবেহ করে দেহ থেকে মাথা কেটে তা দিয়ে ফুটবল খেলে। শিশুদের গায়ে সিমেন্টের প্রলেপ লাগিয়ে করুণ জড়তা সহকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরায়। বন্দীদের চোখ উপড়ে ফেলে। অনেক সময় মুসলমান পুরষদের পুরুষাঙ্গ কেটে দেয়। বন্দীদের হাতের ৫ আঙ্গুলের মধ্যে দুই আঙ্গুল কেটে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের তিন ইশ্বর প্রতিক তিন আঙ্গুল অবশিষ্ট রাখে, মসজিদের ঈমাম ও মুয়াজ্জিনের বাড়ীতে ঢুলে পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে। তিনি বসনিয়া সফর শেষে ফিরে এসে এই লোমহর্ষক তথ্য বর্ণনা করেছেন। [১১]

জার্মানী থেকে প্রকাশিত দীর স্বিগল পত্রিকা নবেম্বর, ৯২ সালের এক সংখ্যায় সার্ব সামরিক অধিনায়ক জেনারেল ফুস্তিকের সাথে এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সেই সাক্ষাতকারের অংশ বিশেষ হচ্ছেঃ

প্রশ্নঃ আপনি কতজন মুসলমানকে নিজ হাতে হত্যা করেছেন?

উঃ আমি কয়েকশ' বন্দী বসনিয়ান মুসলমানকে গুলী করে হত্যা করেছি।।

প্রশ্নঃ আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ?



ইরানে চিকিৎসারত বসনিয়ার আহত মুসলিম

উঃ আমাদের কাছে বন্দীদের পরিবহনের জন্য গাড়ী নেই। তাই তাদেরকে দ্রুত হত্যা করাই সহজ উপায়। উদাহরণ স্বরূপ বলছি। গত জুলাই– ৯২ তে, আমরা ৬৪০ জন মুসলমান এক জায়গায় লুকিয়ে থাকার খবর পাই। আমরা সাথে সাথে তাদেরকে গুলী করে হত্যা করেছি।

প্রশ্নঃ এই হত্যাকান্ডের লক্ষ্য কি?

উঃ ইউরোপ থেকে মুসলমানের অস্তিত্ব খতম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মুসলমানদের উচিত, ইসলাম ত্যাগ করে সার্ব কিংবা ক্রোট খৃষ্টানে পরিণত হওয়া। তাদের তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে, মৃত্যু।

প্রশ্নঃ আপনাদের অর্থ সাহায্য কোথা থেকে আসে?

উঃ সার্ব সম্প্রদায়ই আমাদের অর্থনৈতিক আয়ের উৎস। বেলগ্রেড থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকরাই বসনিয়ায় আমাদের বাহিনীর ৯৯% শক্তি।

প্রশ্নঃ আপনারা কি এই যুদ্ধকে কসোভোর মুসলমানদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করবেন?

উঃ সেখানে আমাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আমরা তাদেরকে তাড়িয়ে দেব। যারা থাকবে তাদেরকে হত্যা করে ইউরোপকে মুসলমান মুক্ত করবো।

হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা মুসলিম বাহিনীর হাতে আটক ২১ বছর বয়স্ক সেনা ইউরিস্লাব হিরাকি হত্যা ও জুলুমের এক চাঞ্চল্যকার তথ্য প্রকাশ করেছে। হিরাকী স্বীকার করেছে কিভাবে সে বিভিন্ন মুসলিম পরিচারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। সার্ব মিলিশিয়াতে অন্তর্ভূক্তির আগে সে কাপড়ের কলে চাকরি করতো এবং সে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে। সে বলেছে, আমরা একটি মুসলিম পরিবারকে হত্যার আগে বললামঃ তোমরা ভয় কর না, আমরা তোমাদেরকে কষ্ট দেব না। তোমরা শুধু দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। 'অথচ আমরা তাদেরকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করছি। তখন আমাদের একজন অধিকনায়ক চীৎকার দিয়ে হত্যার আদেশ দেয়ার সাথে সাথে আমরা বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা করি। ছোট একটি শিশু ম্যাক্সি পরা অবস্থায় দাদীর পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা তাকেও হত্যা করি।

হিরাকী আরো বলে, আহাতুভিস একটি ছোট মুসলিম গ্রাম। কারাগার থেকে পশ্চিমে মাত্র ৫ মাইল দূরে। সেখানে পালিয়ে থাকা একটি পরিবারকে কারাগারে এনে দ্রুত হত্যা করে ফেলা আমাদের সময় ছিল অল্প।

হিরাকী ৬ ইঞ্চি লম্বা ছুরি দিয়ে বসনিয়ার ৩জন মুসলিম সৈন্যের গলা কাটার কথা স্বীকার করে।

হিরাকী ৮/৯ জন মুসলিম যুবতীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার কথাও স্বীকার করেছে। হিরাকী আন্তর্জাতিক তদন্ত কনিশনের কাছে এ সকল অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছে।

অন্য আরেক দল সার্ব সৈন্য এক মুসলিম মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। মহিলার সাথে ছিল তার ১৩ বছরের সন্তান। সৈন্যরা মহিলাকে হিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুসলমান? মহিলা জবাবে 'হাঁ' বলেন, তখনই তারা ছেলেটির মাথা কেটে সাথীদেরকে নিয়ে তা দিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করে।

অন্য আরেক ঘটনা হচ্ছে, এক রুটির ব্যাকারীর পাশ দিয়ে কয়েক সদস্য বিশিষ্ট একটি মুসলিম পরিবার অতিক্রম করছিল। সেখানে একদল সার্ব সৈন্য ছিল। তারা সাথে সাথে ঐ পরিবারকে রুটির চুলায় ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলে এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

হিরাকীর মত আরো ৫৯ জন সার্ব যুদ্ধাপরাধীর তদন্ত শেষ হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বর্ণনা অত্যন্ত লোমহর্ষক ও বেদনাদায়ক। তাদের হাতে কত মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। কি নিষ্ঠুর তারা।

বসনিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এপ্রিল ১৯৯১ হতে নবেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত মোট আটমাসে হতাহতের যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

নিহত–১লাখ ২৮ হাজার ৪৪৮ জন। আহত– ১লাখ ৩৩ হাজার ৫৭১ জন। যাদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে, শুধু তাদের সংখ্যা। নিখোঁজ– ২৫ হাজার ৬৯৮ জন। [১২]



বসনিয়ার মুসলমানদের ১ টুকরো রুটি পাওয়ার চেষ্টা

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে নিহতের সংখ্যা আরো অনেক। একমাত্র সারাজেভোর উপকণ্ঠে সার্ব বাহিনীর হাতে উতিশ শহরের পতনের সময় ১শ' লোক নিহত হয়েছে। নারী ও শিশুদেরকে সুরক্ষিত আশ্রয় স্থলে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে। বন্দী শিবিরগুলোতে চলছে করুণ নির্যাতন। সার্ববাহিনী বন্দী শিবিরে ঢুকে যুবকদেরকে কচুকাটা করছে এবং মগজ বের করে কুকুরকে খাওয়াচ্ছে। ক্ষুধার্ত এলসেশিয়ান কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বহু যুবকের দেহকে ছিন্নভিন্ন করছে। শরীরে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত বের করে তাদের লাশ শুকরের ফার্মে নিক্ষেপ করা হয়। [১৩]

২. উচ্ছেদ অভিযান

সার্ব সম্প্রদায় বসনিয়াকে মুসলমান মুক্ত করতে আগ্রহী। তাই তারা মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তল্লাশী করে তাদেরকে আটক করছে, হত্যা করছে এবং যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তারা হয়েছে শরণার্থী।



খাদ্যের জন্য বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যের হাত

জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশন জুলাই-৯১ সালে জানিয়েছে, মাত্র তিন মাসের নির্যাতনের ফলে বসনিয়ার ২২ লাখ লোক শরণার্থী হয়েছে। (২) উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই মুসলমান। কিছু সংখ্যক ক্রোটও উদ্বাস্তু হয়েছে। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

এক প্রাথমিক হিসেবে জানা গেছে, ক্রোশিয়ায় প্রায় ২০ লাখ, হাঙ্গেরীতে ৫০ হাজার, ইটালীতে ১ লাখ, জার্মানীতে ১ লাখ, তুরস্কে ২০ হাজার, অস্ট্রিয়া, বৃটেন ও অন্যান্য দেশেও আরো কিছু সংখ্যক বসনিয়ার মুসলিম শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। খৃষ্টান দেশগুলো শুধু ক্রোট খৃষ্টান শরণার্থী গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহী, মুসলিম শরণার্থী গ্রহণের বিষয়ে তাদের তেমন আগ্রহ নেই। ব্যতিক্রম হচ্ছে, ক্রোশিয়া বসনিয়ার সীমান্তে

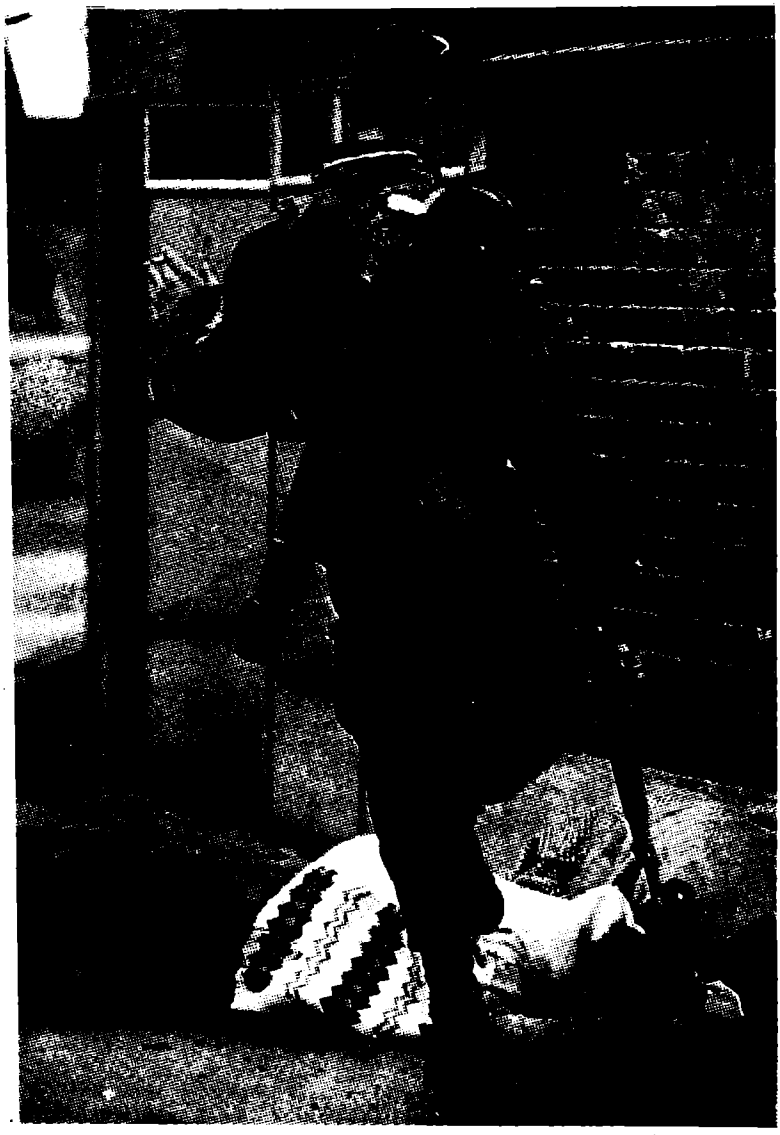

হত্যার এক করুণ দৃশ্য

৩. নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন

বসনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে করুন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মুসলিম মা ও বোনেরা। সার্ব বাহিনীর প্রথম টার্গেট হচ্ছে,মুসলিম পুরুষদেরকে হত্যা করা। আর দ্বিতীয় প্রধান টার্গেট হচ্ছে, সেখানকার মুসলিম নারী সমাজ। তারা শহর ও গ্রামে গিয়ে মুসলিম যুবতী ও মা-বোনদেরকে পাশবিক অত্যাচার করার পর তাদের দুধ কেটে দিচ্ছে এবং অনেককে হত্যা করছে।



সারবিয়ান বন্দী শিবিরে মুসলিম নারী ও শিশু

অবস্থিত হওয়ার কারণে তাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শরণার্থীদের ঢলের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে সেখানে মুসলিম শরনার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক। বসনিয়ার ২৫/৩০ লাখ মুসলমানের মধ্যে মাত্র ৪/৫ লাখ এখন পর্যন্ত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোতে বাস করছে। বিশেষ করে রাজধানী সারাজোভোতেই চার লাখ মুসলমান রয়েছে।

অনেক মুসলিম শরণার্থী বিভিন্ন ইউরোপীর দেশের সীমান্তে খোলা আকাশের নীচে বাস করছে। কোন দেশ তাদেরকে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন অথচ সেখানে চলছে শীত মওসুমের প্রচন্ড হিমপ্রবাহ। তাপমাত্রা ০ ডিগ্রীর বহু নীচে। সর্বত্র বরফ। এই প্রচন্ড শীতের দেশে মানুষ যেখানে ঘরের হিটার জ্বালিয়ে বাস করে, সেখানে খোলা আকাশের নীচে কিংবা তাঁবুতে আশ্রয়গ্রহণকারী মুসলমানদের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? ১৯৯১-৯২-এর শীত মওসুমে আরো ৪ লাখ লোক মারা যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। একদিকে শীত, অপরদিকে যুদ্ধ এবং সর্বোপরি সার্ব বাহিনীর হত্যাকান্ডের মোকাবিলা করে বসনিয়ার মুসলমানরা কতটুকু টিকে থাকতে পারবে?

সম্প্রতি সর্বাধিক মর্মান্তিক খবর দিয়েছে ৯টি ইউরোপীয় দেশ নি'য়ে গঠিত পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা বলেছে, সার্ব বাহিনী কমপক্ষে ১৩টি মহিলা বন্দী শিবিরে ৩৫ হাজার মুসলিম মহিলাকে আটক রেখেছে। এর মধ্যে ৩টি শিবির রয়েছে সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের ভেতরে। ঐ মহিলাদের বয়স নীচের দিকে ৬ বছর এবং উপরে দিকে৪৫ বছর। ঐ মহিলাদের জোরপূর্বক ধরে এনে বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়েছে। সার্ব সৈন্য ও সেচ্ছাসেবীরা দৈনিক বেলগ্রেডসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসে করে আসে এবং ধর্ষণ করে চলে যায়। এভাবে প্রতিদিন এই কাজ চলছে। যে সমস্ত মুসলিম মহিলা প্রতিরোধ করে তাদের উপর চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। শিবিরগুলোতে এ যাবত এজাতীয় ৩২ জন মুসলিম মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। যাই হোক, এই পাশবিক নির্যাতনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সার্ব সম্প্রদায়ের ইচ্ছে হলো, এই মুসলিম মহিলারা গর্ভধারণ করুক এবং তাদের ঐ সন্তানদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'Chetnik' বলা হবে। তারা তাদের ঔরসের সন্তান বুঝানোর জন্য এই পরিভাষা ব্যবহার করে। এরা হবে বিশেষ ধরনের এক বর্ণ যা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলিম যুবতী ক্রোশিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে প্রথম মহিলা বন্দী শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা আশা করছে, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর কিংবা ৯৩ সালের জানুয়ারীর দিকে তারা তাদের প্রথম ব্যাচ 'Chetnik' সন্তান লাভ করবে। কেননা, ইতিমধ্যেই গর্ভবতী মুসলিম মহিলারা সন্তান প্রসব করবে।[১৪]

অন্য এক বর্ণনায় মহিলা বন্দী শিবিরের সংখ্যা ১৬ বলে জানাগেছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় জোট সার্ব বাহিনীর এই সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সম্মতিক্রমে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচারের আহ্বান জানিয়েছে। একই সাথে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহলও একই দাবী জানিয়েছেন।

অপরদিকে, জার্মান বেতার একজন মহিলা পাদ্রীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে। সার্ব বাহিনী ঐসকল মুসলিম যুবতীকে গর্ভধারণের লক্ষণ দেখা দেয়ার আগ পর্যন্ত ছাড়ে না। গর্ভধারণ করলে তাদের পক্ষে গর্ভপাত করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।[১৫]

বিশ্বের ১শ কোটি মুসলমান কি এখনও ঘুমাবে? তাদের কি চেতনা ফিরবে না? একটা জাতির জন্য এর চাইতে বেশী অপমান আর কি হতে পারে?

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরেক লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সার্ব বাহিনী এক গ্রামে ঢুকে মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে দাঁড় করায়। পরে মুসলিম রমণীদেরকে উলঙ্গ করে। সবশেষে নিজ সন্তান ও আত্মীয়দের সামনে তাদেরকে ধর্ষণ করে। এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের মানষিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা।

সার্ব বাহিনী মুসলিম মহিলাদেরকে কারাগারে উলঙ্গ রাখে। এরপর যাকে তাকে ধর্ষণ করে। বন্দী শিবিরের বাইরে কোন সময় গর্ভবতী মায়ের পেটে কি সন্তান আছে তা জানার জন্য তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যন্ত গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করে তদন্ত করে ও সন্তানটিকে মেরে ফেলে। এছাড়াও বেয়নেটের খোঁচায় গর্ভবতী মায়েদের পেট চিরে সন্তান বের করে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। সার্ব বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নারী, পুরুষ ও শিশুরা অজানা পথের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে: তারা জানে না কোথায় তাদেরকে যেতে হবে এবং কিভাবে যেতে হবে? কে তাদের দেখাশুনা করবে? শেষ পর্যন্ত কেউ বন্দী শিবিরে, কেউ শরণার্থী শিবিরে কেউ রাস্তায় গুলীতে নিহত আবার কেউ হাসপাতলে শর্য্যাশায়ী। বহু পরিবার একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শিশুদেরকে বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বন্দী মা-বোনেরা জানে না, তাদের পরিবারের কে কোথায় আছে। কেউ বা পাহাড়, জঙ্গল ও বিভিন্ন স্থানে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এই হচ্ছে, সেখানকার মুসলামানদেরকরুণঅবস্থা।

মার্কিন টেলিভিশন সংস্থা সি এন এন বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সার্ব বাহিনীর মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত এক লোমহর্ষক ফিল্ম তৈরি করেছে। তাতে সার্ব বাহিনী কর্তৃক পাঁচ বছরের বালিকা থেকে শুরু করে মুসলিম রমণীদের ইজ্জত আবরু ধ্বংসের করুণ চিত্র স্থান পেয়েছে।

ঘটনার ভয়াবহতার এখানেই শেষ নয়। শেষ পর্যন্ত সরিষার মধ্যেও ভূত দেখা দিয়েছে। তাহলে, সরিষার ভূত তাড়াবে কিভাবে? মিসরের চিকিৎসক এসোসিয়েশনের ত্রাণ কমিটির প্রধান এবং মিসরের বসনিয়ান ত্রাণ কমিটির সুপারভাইজার ডঃ আশরাফ আবদুল গফুর বলেন, জাতিসংঘ বসনিয়ার রাজধানী সারাজেভোতে শান্তি রক্ষী বাহিনী পাঠিয়েছে। তাদের অধিকাংশ সদস্য খৃষ্টান। তারা সার্ব বাহিনীর কাছে মুসলিম যুবতীর বিনিময়ে ত্রাণ সাহায্য পাচার করা শুরু করে। অথচ ত্রাণ সাহায্য পাঠানো হয়েছে অবরুদ্ধ মুসলিম ও ক্রোট জনগণের উদ্দেশ্যে। পরে শান্তি রক্ষী বাহিনীতে মিসরীয় মুসলিম সৈনিকরা তা টের পায় ও তাদের হস্তক্ষেপে ঐ কাল অধ্যায়ের অবসান হয়। [১৬]

প্যারিস বেতার যুগোশ্লাভ ভাষায় প্রচারিত এক তথ্য বিবরণীতে বলেছে, সার্ব সম্প্রদায় কমপক্ষে ৩০ হাজার মুসলিম মহিলার শ্লীলতা হানী করেছে। [১৭]

সার্ব বাহিনীর আরো জঘন্য নির্যাতনের খবর পাওয়া গেছে। তারা একজন বসনিয়ান মুসলিম যুবককে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্য বেদম প্রহার করতে থাকে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় তার উপর অত্যাচার বহু গুণে বেড়ে যায়। ছেলের কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে মা সন্তানকে তাদের

আদেশ মান্য করার আবেদান জানায়, যেন সে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।[১৮]

হায়! এই মুসলিম ভাই-বোনদেরকে আজ কোন মুসলিম বীর রক্ষা করবে? বৃটিশ টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক রিসার্চ বিস্টন সারাজেভোতে এক অসহায় গর্ভবতী মুসলিম মহিলার সাথে আলাপ করে লিখেছেন,[১৯] ?? মহিলাটি সার্ব বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মহিলাটির নাম সাফা কুনাকুভিটস। ৪মাস ধরে তিনি সার্ব সৈনিক দ্বারা গর্ভবতী হয়েছেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, এই সন্তান আমার নয়, এটা যেন আমার শরীরে একটা পাথর বিশেষ। সারাজেভোর কসোভো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাফা আরো আক্ষেপ করে বলেন, সন্তানটি প্রসবের পর যেন আমার দেখার আগেই ডাক্তাররা তাকে সরিয়ে নেয়। নচেত আমি তাকে দেখা মাত্র গলাটিপে হত্যা করবো।

টাইমস পত্রিকা আরো লিখেছে, প্রায় ৩০ হাজার মুসলিম মহিলা এভাবে বন্দী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে এবং লজ্জা-শরমে তাদের জীবন সংকুচিত হয়ে আসছে। তাদের উপর চলছে সার্ব সৈনিকদের পরিকল্পিত ও নিয়মিত ধর্ষণ। এইভাবে বহু মহিলা বন্দী শিবিরে দাসীর মত জীবন যাপন করছে এবং সৈনিকরা তাদেরকে ভোগ-ব্যবহার করছে। বন্দী শিবিরের মুসলিম মহিলারা এখন শুধু জন্ম নিরোধক টেবলেট ছাড়া আর কিছুই চাচ্ছে না। তাদের জীবন আজ সত্যিই দুর্বিসহ। তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই।

পরিহাসের বিষয়, জাতিসংঘ নিজ পতাকা উড়িয়ে সারাজেভোর চিড়িয়াখানা থেকে পশুদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আহা! এতটুকু আচরণও যদি আজ সেখানকার মুসলমানদের সাথে করা হতো![২০]

৪. মসজিদ আক্রমণঃ

১৯৯১ সালের রমজান মাস, ঈদের নামাজ শেষে মুসল্লীরা যখন মসজিদ থেকে বের হয়েছে, তখন সার্ব বাহিনী ২ জন মুসল্লীকে ধরে জবেহ করে। এই করুণ দৃশ্য দেখে বাকী মুসলমানরা ভয়ে মসজিদের ভিতর আশ্রয় নেয় ও দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সার্ব বাহিনী জোর করে মসজিদের ঢুকে বোমা নিক্ষেপ ও গোলা বর্ষণ করে প্রায় ১শ মুসল্লীকে হত্যা করে। তারপর তারা মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে এবং লাশের উপর ও মসজিদের ভেতর পেশাব-পায়খানা করে বেরিয়ে যায়। জবরনিখ শহরে এক মসজিদে ঢুকে তারা মদপান ও নাচ গান করে এবং মসজিদের উপর নিজেদের পতাকা উড়ায়।

প্যারিস বেতার যুগোশ্লাভ ভাষায় প্রচারিত প্রোগ্রামে বলেছে, সার্ব বাহিনী কমপক্ষে ২৮ জন ইমামকে হত্যা করছে, ৩২ জন ইমামকে আটক করেছে এবং ৭৫০টি সমজিদ আংশিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস করেছে। এটা হচ্ছে সার্ব আগ্রাসনের প্রথম ২/১ মাসের কথা। এর পরে তারা যে সকল মুসলিম শহর ও গ্রাম জবরদখল

করেছে, সেখানে সর্ব প্রথম মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করেছে এবং সেগুলোর সংখ্যাজানা নেই।

বসনিয়া-হারজেগোভিনার প্রেসিডেন্ট আলী ইজ্জত বেগভিটস বলেছেন, তারা এক মসজিদের মিনারায় মাইক লাগিয়ে সেখান থেকে গান-বাজনা শুরু করে দেয়।

মসজিদ-মাদ্রাসার উপর সার্ব বাহিনীর আক্রমণের কারণ হলো, মুসলমানের জীবনে মসজিদ-মাদ্রাসার ভূমিকা সর্বাধিক। এগুলোর মাধ্যমেই সমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয় এবং এগুলোকে কেন্দ্র করেই মুসলমানরা দীনি শিক্ষা ও দাওয়াতী কাজ করে থাকেন। ফলে, মসজিদ-মাদ্রাসার এই ভূমিকা তাদের 'কাছে পরিষ্কার বলেই তারা এগুলোকে প্রথম ও প্রধান টার্গেটে পরিণত করেছে। আজ যদি বসনিয়া-হারজেগোভিনার মসজিদ-মাদ্রাসাকে রক্ষা করা না যায় তাহলে, সেখান কার মুসলমানদের পরিচিতি ও দীনী চেতানা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. ছিন্নমূল শিশু সংকট

বসনিয়ার শিশুদের সমস্যা সবচাইতে বড় সমস্যা। এই অসহায় শিশুদেরকে কে প্রতিপালন করবে? অনেকেই মা-বাপ হারা, কেউ যুদ্ধে মারা গেছে, কারুর মা-বাপ বন্দী শিবিররে আটক, আবর কেউ কেউ রয়েছে নিখোঁজ। ফলে শিশুরা আজকে সবচাইতে অসহায়। ক্ষুধার তাড়না, উদ্বাস্তু জীবন যাপন, গোলাগুলী বিনিময় ইত্যাদির কারণে শিশুদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বহু শিশু মারা গেছে। প্রচন্ড হিম প্রবাহ এখন শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। তাই শিশুদের যত্নের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।



জার্মান ইয়াতিম খানায় বসনিয়ার মুসলিম শিশু

এক হিসেবে জানা যায়, ৩৫ হাজার মুসলিম শিশু ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছে। তাই জার্মানী, বৃটেন,ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও স্পেন বহু শিশু দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইটালীতে আছে ৫ হাজার শিশু। ঐ সকল শিশুকে খৃষ্টান বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে।

ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণকারী ৮বছর বয়স্কা মুসলিম বালিকা তাইয়েব। তাকে খৃষ্টান বানানোর আগে হঠাৎ করে তার ভাইয়ের সাক্ষাত লাভ করে জানায়, এক ব্যক্তি তাকে খাবার ও চকলেট দেয় এবং শিশু শারণার্থী শিবিরের প্রশাসন তাকে ঐ ব্যক্তিটির সাথে বাইরে ঘুরাফিরা ও গীর্জায় যাওয়ার অনুমতি দেয়। আমি তার সাথে গীর্জায় প্রার্থনা জানাই। তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দান করে।[২১]



৩ বছর বয়স্কা ইন্দিরা স্রয়া গ্রেনেড আক্রমনে ডান পা ও বা পাকে হারিয়েছে। সারাজেভ হাসপাতাল

জেদ্দা ও তুরস্কের মুসলিম ব্যবসায়ীরা কিছু সংখ্যক মুসলিম শিশুকে খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে রক্ষার একটি উদ্যোগ নিয়েছে। তারা ক্রোশিয়ার রাজধানী জাগরেব ও সাইপ্রাসে মোট ১০ হাজার শিশুর ভরণ-পোশন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

১৯৯২ সালের ৩রা অক্টোবর, ইউনিসেফ কর্মকর্তারা বলেছেন, ৬ মাসের যুদ্ধে বসনিয়ায় ১০ হাজার শিশু নিহত ও অন্য ৩০ হাজার আহত হয়েছে। সেখানে আরও ১০ লাখ শিশু আছে। তাদেরকে রক্ষা করতে না পারলে তারাও মারা যাবে।[২২]

জার্মানীর দীর স্বিগল পত্রিকার নবেম্বর মাসের এক সংখ্যায় জানাগেছে যে, বসনিয়ার শিশুদেরকে গাড়ীতে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন ছদ্ম নামধারী সংস্থা তাদেরকে গীর্জার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। আলবেনিয়া ভিত্তিক একটি মাত্র সংস্থা ইউরোপের বিভিন্ন গীর্জার কাছে ২০ হাজার শিশুকে বিক্রি করেছে।

৬. বন্দী শিবির

সার্ব বাহিনী অনেকগুলো বন্দী শিবির তৈরী করেছে। সেগুলোতে মুসলিম যুবকদেরকে আটক রাখা হয়েছে। তাদের উপর চলছে অব্যাহত জুলুম-নির্যাতন। তাদেরকে হত্যাও করা হচ্ছে নির্বিচারে। বন্দী শিবিরে প্রায় দেড় লাখ লোককে আটক রাখা হয়েছে। মানবাধিকার আজ নিভৃতে কাঁদে। সেখানে তাদের খাওয়া-পরার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। অত্যাচার-নির্যাতন হচ্ছে নিত্যকার সাথী। বন্দী শিবিরের সংখ্যা ৫০-এর কম নয়। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ ঐ বন্দী শিবিরগুলোর বিরুদ্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে।[২৩]

একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, সাবেক ইসরাইলী গৃহ মন্ত্রী এরিল শারন ইসরাইল সরকারের অনুমতির ভিত্তিতে বসনিয়ায় অধিকৃত ফিলিস্থিনের অনুরূপ আরও ৭টি বন্দী শিবির প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। সম্প্রতি কয়েকজন সার্বিয়ান কর্মকর্তা ইসরাইল সফর করে ঐ চুক্তিতে পৌছেছে। এ সকল শিবিরে মুসলিম নির্যাতন চালানো হবে। ৭ এছাড়াও তারা আরো অনেক নির্যাতন চালাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আছে শহর অবরোধ করা, পানি ও বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া, অবরুদ্ধ শহরে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছতে না দেয়া। ক্ষুধা ও বুভুক্ষুতা সৃষ্টি করা, মুসলমানদের বাড়ী-ঘর নিশ্চিহ্ন করা ও সম্পদ লুট করা ইত্যাদি। মানুষের চিন্তায় যত প্রকার নির্যাতন সম্ভব তারা সবগুলোই করছে, কোন বাদ দিচ্ছে না।

স্বাধীনতার যুদ্ধের আগেও মুসলমানদের উপর পরোক্ষ নির্যাতন চালানো হয়। তাদের সাথে বর্ণ বৈষম্য করা হতো এবং প্রশাসন, বিচার, সামরিক ও কূটনৈতিক চাকরিতে মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। মুসলিম এলাকাগুলোতে বেকারত্ব ও দারিদ্র নিত্যকার সাথী। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদেরকে গরীব ও অবহেলিত করে রাখা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, সার্ব বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে শরণার্থীরা যে সকল শহরে বাস করছে, সেখানে বর্তমানে (ডিসেম্বর-১৯৯২) ব্যাপকহারে টাইফয়েড দেখা দিয়েছে। সংস্থা আরো বলেছে, সারাজেভো থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ত্রাকনিকে ব্যাপক হারে টাইফয়েড দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সার্ব বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ শহরগুলোতে ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর যে ব্যবস্থা করেছে, সার্ব বাহিনী তাতেও বাধা দিচ্ছে। ফলে, ত্রাণ কর্মসূচী ব্যর্থ হচ্ছে এবং ক্ষুধা ও বুভুক্ষুপিড়ীত মানুষের কাছে খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সারাজোভোতে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর মিসরীয় জেনারেল বলেছেন, জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। সার্ব আক্রমণের মুখে কোথাও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।[২৪]

সামগ্রীক অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে, আজ বসনিয়ার মুসলমানরা সর্বাধিক পর্যুদস্ত ও বিপদগ্রস্ত। আরও জানাগেছে, সার্ব বাহিনী ক্ষুধার্ত বালকদেরকে বিষ মাখা পাউরুটি খেতে দেয়, মুখে দেয়া মাত্রই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জীবন্ত শিশুদেরকে নিক্ষেপ করা হয় ফুটন্ত পানিতে। সাথে সাথে তারা প্রাণহীন সিদ্ধ গোশতে পরিণতহচ্ছে।[২৫]

বসনিয়ার আরেকটি অঞ্চলে তিনজন মুসলিম তরুণীকে উলঙ্গ করে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে দাঁড় করিয়ে তাদের গলায় একটি বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তাতে লেখা ছিল, সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। একটানা তিনদিন ধরে তাদের উপর চলে গণধর্ষণ। চতুর্থ দিনে তাদের শরীরে গেসোলিন ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।[২৬]

নিউজউইক আরো লিখেছে, মুসলিম তরুণীদেরকে লাইনের পর লাইন করে শুইয়ে গণধর্ষণের পর জবেহ করে তাদের দেহকে টুকরো টুকরো করা হয়। পর্দানশীন মা-বোনদেরকে উলংঙ্গ করে জোরপূর্বক মাঠে নামিয়ে কাজ করানো হয়।[২৭]

সার্ব বাহিনী কোন কোন স্থানে চালিয়েছে চরম বর্ণবাদী আচরণ। তারা মুসলমানদের উপর নির্দেশ জারি করেছে যে, বিকেল ৪টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাড়ী থেকে বের হতে পারবে না, নিজের গাড়ী চালাতে পারবে না, টেলিফোনে আলাপ করা যাবে না এবং বাড়ীর বাইরে তিনের বেশী লোক একত্রিত হতে পারবে না। এগুলো ছিল আগের পরিস্থিতি। বর্তমানে আর কোন মুসলমান তাদের বাড়ী ঘরে নেই, সবাই উদ্বাস্তু।

৭ম অধ্যায়

বসনিয়া—হারজেগোভিনার যুদ্ধের অবস্থা

আমরা ইতিপূর্বে সার্ব বাহিনীর সামরিক শক্তি ও এর উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সার্বিয়ার অস্ত্র কারখানার উৎপাদনের জন্য রাশিয়া ও গ্রীসসহ অন্যান্য খৃষ্টান দেশ কাঁচামাল সরবরাহ করে। এমনকি রাশিয়া এবং গ্রীস তাদেরকে আধুনিক অস্ত্রও দিয়ে থাকে। এছাড়া ফেডারেল যুগোশ্লাভ বাহিনী এবং সার্ব মিলিশিয়াদের সাথে রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার যোদ্ধারাও লড়াই করছে। বসনিয়ার মুসলিম যোদ্ধাদের অবস্থানের উপর রাশিয়ান পাইলটরা মিগ বিমানের মাধ্যমে বোমা বর্ষণ করে। ক্রোট বাহিনীর কাছে কয়েকজন রাশিয়ান পাইলট আটক হওয়ার পর ঐ তথ্য জানা গেছে। মাসে ১শ ডলার বেতনে রাশিয়ার ১৭৫০ জন ভাড়াটিয়া সৈন্য সার্ব বাহিনীর পক্ষে বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।[২৮]

টমক নামক একজন পুলিশ ভাড়াটিয়া ড্রাইভারের ঘটনা জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে জানায় যে, সার্ব বাহিনী পোল্যান্ড থেকে মাথা পিছু মাসিক আড়াই থেকে তিন হাজার ডলার বেতনে ৪০ জন লোক ভাড়া করেছে। সে আরো জানিয়েছে যে, তারা পূর্ব জার্মানী, লিথুনিয়া, লাটভিয়া এবং ইউক্রেন থেকেও লোক ভাড়া করে যুদ্ধে ব্যবহার করছে। তারা খৃষ্টান হওয়ার কারণে সার্বিয়ার মুসলিম হত্যার সহযোগিতা করাকে জরুরী মনে করে।

যুগোশ্লাভিয়ার নিয়মিত সৈন্য, সার্ব মিলিশিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সামরিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য নিরস্ত্র বসনিয়ান মুসলমানদর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পানির মত সহজ হয়েছে। সার্ব বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বিমান, আর্টিলারী ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে।

পক্ষান্তরে, মুসলিম বাহিনীর কাছে কিছু সংখ্যক বন্দুক ছাড়া আর অন্য তেমন কোন হাতিয়ার নেই। বন্দুক দিয়ে ঐসকল আধুনিক ও ভারী অস্ত্রের মোকাবিলা কি করে সম্ভব? তবুও তারা লড়াই করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে টিকে আছে। অনেক শহরের পতন হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি শহরের উপর তারা এখনও নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছেন।

নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়া-হারজেভিনা ও সার্বিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে নিরস্ত্র মুসলিম যোদ্ধাদের অস্ত্রের সম্ভাব্য সকল উৎস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, সার্ব বাহিনীর কাছে ফেডারেল যুগোশ্লাভিয়ার সকর অস্ত্রতো আছেই। উপরন্তু, রাশিয়া ও গ্রীস গোপনে তাকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট ষড়যন্ত্র।

নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়া-হারজেগোভিনার আকাশে সামরিক বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বিয়ান সামরিক বিমান উড়ছে ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বসনিয়ান সরকার বসনিয়ার উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।

বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোট যোদ্ধারা সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে পারছে না। তাদের মোট ৫টি ফ্রন্ট আছে। সেগুলোহচ্ছেঃ

১. আরব মুসলিম ফ্রন্ট

এতে প্রায় ১২০ জন আরব মুজাহিদ আছেন। তারা বসনিয়ার মুসলিম যোদ্ধাদের দৈহিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে আবু আবদুল্লা আযীয একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আফগান জেহাদ থেকে বসনিয়ায় ফিরে গেছেন। তিনি শাহাদাতের তীব্র প্রেরণায় উজ্জীবিত।

২. মুসলমান সমাজ

৯টি উপদলের সমন্বয়ে এই ফ্রন্ট গঠিত। প্রত্যেক উপদলে আছে ২শ মুজাহিদ। তাদের কাছে অল্প ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এই ফ্রন্টের অধিনায়ক হলেন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাহমুদ কারজিতস। ফ্রন্টের মোট মোজাহিদ সংখ্যা১৮০০।

৩. বসনিয়া—হারজেগোভিনা ফ্রন্ট

এই ফ্রন্টে ৭০ হাজার যোদ্ধা আছে এবং তাদের কাছে রয়েছে হালকা অস্ত্রশস্ত্র। তাদের কাছে ২ টি ট্যাংক, ২টি সাঁজোয়া গাড়ী ও সার্ব বাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ২টি কামান আছে। এই ফ্রন্টের ক্রোটরা ক্রোশীয় ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য। ফ্রন্টের মুসলমানের চাইতে ক্রোশীয়দের সংখ্যা বেশী। এই ফ্রন্টের ক্রোটরা বসনিয়া-হারজেগোভিনায় তাদের ক্ষুদ্র ক্রোট রাষ্ট্র 'হারজেদ- সনাক'-এর পতাকা উড়ায়।

৫. ক্রোট ফ্রন্ট

এদের ৩০ হাজার যোদ্ধা আছে। এই ফ্রন্টে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ক্রোশিয়ান ফ্রন্টের চাইতে বেশী আছে। তারা বসনিয়াকে বিভক্ত করার বিরোধী। তারা মুসলিম, ক্রোট ও সার্ব সম্প্রদায়ের জন্য অবিভক্ত বসনিয়ার আহ্বান জানায়।

বসনিয়া সরকার বলেছেন, তাদের যে মুহূর্তে অস্ত্র দরকার, সে মুহূর্তে অস্ত্র না দিয়ে ত্রাণ সাহায্য দেয়া হচ্ছে। অস্ত্র পেলে তারা আগ্রাসী সার্ব বাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে পারে। তারা আরো বলেছেন, আমাদের ১ লাখ যোদ্ধা আছে। তাই ত্রাণ সাহায্য নয়, বরং আগে অস্ত্র সাহায্য চাই। যদিও তাদের ত্রাণ সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। অস্ত্র না হলে টিকা যাবে না। আর টিকতে না পারলে, ত্রাণ সাহায্য দিয়ে কি হবে?

৮ম অধ্যায়

বসনিয়া সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকরা কোন জাতির স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনকে অস্বীকার করতে পারে না। কোন এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামত অনুযায়ীই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। সেজন্য জতিসংঘসহ বিশ্বের সকল গণতন্ত্রিক শক্তি বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বসনিয়া-হারজেগেভিনা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে। ইউরোপীয় জোট আগেই এক স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোট সম্প্রদায় স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়ায় সেখানকার সার্ব সম্প্রদায় সার্বিয়ান সরকারের ইঙ্গিতে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং ১৯৯২ সালের ৬ই এপ্রিল বসনিয়া-হারজেগোভিনায় স্বাধীন সার্ব রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। এরপর তারা মুসলমান ও ক্রোটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। শুধু তাই নয়, মুসলমান ও ক্রোটদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্যও তারা চেষ্টা চালায়। এক পর্যায় তারা সফল ও হয় এবং ১৯৯২ সালের ৩রা জুলাই, বসনিয়ার ক্রোট অধিবাসীদের একটি অংশ বসনিয়ায় 'হারজেদ-বসনিয়া' নামে একটি মিনি ক্রোট রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়।

কিন্তু বসনিয়া-হারজেগোভিয়নার মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সজাগ। তারা মুসলমান ও ক্রোটদের মধ্যে ঐক্য, সমঝোতা ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন এবং ক্রোশিয়ান সরকারের সাথে বসনিয়ার ভবিষ্যত সরকারের রূপরেখা নিয়েও মতৈক্যে পৌঁছেছেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্রোশিয়ার সমর্থন অব্যাহত থাকায় মুসলমানদের জন্য কাজ করা সহজ হয়েছে। কেননা, ক্রোশিয়ান ভূমি ছাড়া বহির্বিশ্বের সাথে বসনিয়া-হারজেগোভিনার স্থল ও নৌপথ নেই। সারাজেভো বিমান বন্দরের মাধ্যমে কেবল আকাশ পথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। তাও আবার সার্বিয়ান বিমানের আওতায়। তাই বিমান পথের যোগাযোগ মূলত অসম্ভব। স্বয়ং জাতিসংঘের ত্রাণ-বিমান পর্যন্ত সার্বিয়ান গোলার হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় ত্রাণ সাহায্য ব্যহত হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশ হিসেবে বসনিয়ার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ইউরোপীয় জোটের উপর অর্পিত হয়। ৬ই এপ্রিল ইউরোপীয় জোট বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বীকৃতি দেয়ায় একই দিন সার্ব সম্প্রদায়ও বসনিয়ায় তাদের সার্ব রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

১৯৯২ সালের ১১ই মে ইউরোপীয় জোট বেলগ্রেড থেকে নিজ রাষ্ট্রদূতদেরকে তলব করে এবং ১২ই মে যুগোশ্লাভিয়াকে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা পরিষদ থেকে বহিষ্কার করে। ২২ শে মে জাতিসংঘ বসনিয়া-হারজেগোভিনার সদস্যপদ মঞ্জুর করে। পরিষদ বসনিয়া-হারজেগোভিনার উপর আক্রমণ বন্ধ ও যুদ্ধ বিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় ৩০ শে মে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি আরোপ

করে। ২রা জুন ইউরোপীয় জোট সার্বিয়া-মন্টেনেগ্রোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি অনুমোদন করে। সারাজেভো শহর দীর্ঘ ৩ মাস সার্ব বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকার পর ৩০ শে জুন, প্রথম সেখানে জাতিসংঘের ত্রাণ বিমান পৌঁছে। ১লা জুলাই আমেরিকান বংশোদ্ভূত কোটিপতি মিলান প্যানি সার্বিয়া-মন্টেনেগ্রোর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু চরমপন্থী প্রেসিডেন্ট স্লভোদনের কারণে তার পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা, রাশিয়া,রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে স্বগোত্রীয় সার্বদের খাদ্য ও অস্ত্রসহ সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেছে। তাই সার্বিয়া দুর্বল হয়নি এবং যুদ্ধের তীব্রতা ও হ্রাস পায়নি।

১৭ ই জুলাই, বসনিয়ার যুদ্ধরত তিন পক্ষ ইউরোপীয় জোটের উদ্যোগে লন্ডনে এক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু এর পরেই সাথে সাথে সার্ব বাহিনীর তা ভঙ্গ করে। এইভাবে বহুবার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু প্রতিবারই তারা ভঙ্গ করে।

১৪ই আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়ায় ত্রাণ তৎপরতার নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৬ শে আগস্ট লন্ডনে ইউরোপীয় জোটের উদ্যোগে শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি, দ্রুত শান্তি আলোচনা শুরু এবং জবরদখল ত্যাগ করে পূর্বের সীমানায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর, ইউরোপীয় জোট ও জাতিসংঘ জেনেভা শান্তি সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৬ই সেপ্টেম্বর, জাকার্তায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বসনিয়ায় সার্ব আগ্রাসনের নিন্দা করা হয়।

২৩ শে সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘ থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। ৯ই অক্টোবর, নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়া-হারজেগোভিনার আকাশে সামরিক বিমান উড্ডয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সার্ব বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ২৮শে অক্টোবর জাতিসংঘের একজন তদন্তকারী বলেছেন, বসনিয়ায় আজ পূর্ণ মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান চলছে।

১৭ ই নবেম্বর, নিরাপত্তা পরিষদ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে নৌ অবরোধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ন্যাটো জোট নৌ অবরোধ সফল করার জন্য এড্রিয়াটিক সাগরে জাহাজ পাঠিয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হবে মনে হয় না। কারণ, স্থলপথে সার্বিয়ায় সকল দ্রব্য গোপনে আসতে পারে। মূল কথা, অর্থনৈতিক শাস্তি কার্যকর হচ্ছে না।

মুসলিম বিশ্বও এবাপারে কিছু চেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৯২ সালের ১৬ই জুন ইস্তাম্বুলে ৫ম জরুরী ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বসনিয়া-হারজেগোভিনার প্রতি অর্থনৈতিক ও ত্রাণ সাহয্যের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও সম্মেলন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি কার্যকর না হলে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য জাতিসংগের প্রতি আহ্বান জানায়। সম্মেলন বসনিয়াও মুসলমানদের

বিরুদ্ধে অত্যাচার, নির্যাতনের জন্য সার্বিয়াকে অভিযুক্ত করে। সম্মেলন সদস্যদেশগুলো প্রতি সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোকে স্বীকৃতি দান না করার আহ্বান জানায় এবং সার্বিয়ার প্রতি বসনিয়া থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, সার্ব মিলিশিয়াকে অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ বন্ধ এবং অন্যান্য সকল সামরিক পদক্ষেপ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সম্মেলন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এর ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি বসনিয়ায় মানবিক সাহায্য ও পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য দানের আহ্বান জানিয়েছে।

সার্বিয়া মুসলিম বিশ্ব, ইউরোপীয় জোট ও জাতিসংঘসহ সকল সংস্থার আহ্বান লংঘন করে বসনিয়ায় মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান, হত্যা, জুলুম-নির্যাতন, যাবতীয় অমানবিক ও পাশবিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য ১৯৯২ সালের ১৭ই নবেম্বর ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ডঃ হামিদ গাবিদ সারাজেভো সফরে যান। তারপর জেদ্দায় ১৯৯২ সালের ১লা ও ২রা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ জরুরী ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন। সম্মেলনে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ৫০টি সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে এবং তাতে বসনিয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জেনেভা সম্মেলনের যৌথ সভাপতিদ্বয় মিঃ সাইরাস ভ্যান্স এবং ডেভিড ওয়েনও আমন্ত্রিত ছিলেন। মিঃ সাইরাস ভ্যান্স হচ্ছেন জেনেভা সম্মেলনে জাতিসংঘের এবং মিঃ ডেভিড ওয়েন ইউরোপীয় জোটের যৌথ সভাপতি।

সম্মেলনে বসনিয়ার উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সম্মেলন সংস্থার সদস্যদেশগুলোকে সেখানে অস্ত্র পাঠানোর অনুমতি এবং সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়াও সম্মেলন সদস্যদেশগুলোর প্রতি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রতিরক্ষার আওতায় বসনিয়াকে অস্ত্র সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে। কেননা জাতিসংঘের সনদের ৭নং অধ্যায়ের ৫১ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য ব্যক্তিত ও সামষ্টিকভাবে অস্ত্র সাহায্যের অধিকার স্বীকৃত, সম্মেলন, নিরাপত্তা পরিষদকে ১৯৯৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত বসনিয়া-হারজেগোভিনা সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা পর্যালোচনার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ কিছু করতে ব্যর্থ হলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা সম্ভাব্য আর কি করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে।

ইতিমধ্যে, তুরস্ক ও মিসর জরুরী ইসলামী শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে। সম্মেলনে হয়তো কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে।

আশংকারায় গ্রীসও সার্বিয়াকে বাদ দিয়ে বলকান দেশসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বসনিয়ায় সার্ব আগ্রাসন বন্ধ এবং কসোভো ও মাকদুনিয়ায় সম্ভাব্য সার্ব আগ্রাসণের বিরুদ্দে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

শুভংকরের ফাঁক

বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সার্ব আগ্রাসন ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিসংঘসহ ইউরোপীয় জোটের ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের

সারসংক্ষেপ হলঃ সার্ব বাহিনীকে বসনিয়া দখলের সুযোগ দান, মুসলিম উচ্ছেদ অভিযানকে সফল করা, তাদেরকে একট শরণার্থীর জাতিতে পরিণত করা, হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যম মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করা এবং ইউরোপে মুসলমানদেরকে দুর্বল করা ইত্যাদি। বসনিয়া–হারজেগোভিনা আজ তাদের কাছে একটা খেলনা। নচেত কোন্ যুক্তিতে সদ্য স্বাধীনতা ঘোষণাকারী নিরস্ত্র একটি জাতিকে ইউরোপের ৩য় সামরিক শক্তির অধিকারী যুগোশ্লাভ বাহিনীর তোপের মুখে ছেড়ে দিয়ে তারা নীরব ভূমিকা পালন করছে? বরং বসনিয়ায় অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

প্রথমতঃ

তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যে যুদ্ধ বন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়, তারা তা ভাল করে জানে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের টালবাহানা ও দীর্ঘ সূত্রিতা অত্যন্ত দুঃখজনক। জাতিসংঘ এ ব্যাপারে দ্রুত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়নি। শান্তি রক্ষীবাহিনী পাঠানোর প্রথম প্রস্তাবে অর্থডক্স খৃষ্টান মহাসচিব বুট্রোস ঘালি জাতিসংঘের অর্থাভাবের সমস্যা তুলে ধরে তা নাকচ করেছেন। অথচ এর অল্প কয়েকদিন পর জাতিসংঘ কম্পোচিয়ায় ১৬ হাজার শান্তি রক্ষী বাহিনী পাঠায়। এরপর সৌদী সরকার একা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি রক্ষী বাহিনীসহ বসনিয়ার সকল খরচ বহনের ইঙ্গিত দেয়ায় জাতিসংঘের সুর বদলে যায়।[২৮] তখন জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় জোট বলতে শুরু করে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বসনিয়া–হারজেগোভিনাকে অস্ত্রমুক্ত করা। কেননা, অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়ে করা ঠিক নয় এবং এক পক্ষকে অস্ত্রে সজ্জিত করাও উচিত নয়। মুসলমানদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করলে দুই পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। এখন তো শুধু এক পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে। কি সুন্দর বুদ্ধি! তাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। তারপর আলোচনার যে নাটক অভিহিত হচ্ছে, তাতে যুদ্ধ বন্ধ, সার্ব বাহিনী প্রত্যাহার, জবর দখলকৃত এলাকা ফেরতদানসহ কোন কিছুর অগ্রগতিতো হয়নিই বরং মুসলমানদের দুঃখ–কষ্ট হাজার গুণে বেড়ে গেছে।

শান্তি রক্ষী পাঠানের ব্যাপারে যথেষ্ট গড়িমসি করার পর শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। 'কিন্তু সার্ব বাহিনী তাদেরকে নিষ্ক্রীয় করে রেখেছে এবং তাদের মিশনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তারা যুদ্ধ বিরতিতো করতেই পারেনি, শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী পর্যন্ত বিলি করতে পারছে না এবং সারাজেভো বিমান বন্দর খোলা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। মাঝে মাঝে একটু–আধটু কাজ করে দায় সারা গোছের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে।

এরপর মুসলিম বিশ্ব দাবী করেছে, সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বসনিয়া–হারজেগোবিনাকে মুক্ত করা হোক। কিন্তু বৃটেন এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন, যেখানে মার্কিন স্বার্থ নেই সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন মার্কিন সৈন্যও মারা যেতে দেবে না।

ডিসেম্বর ৯২-এর মাঝামাঝি। রাশিয়ান পার্লামেন্ট সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে জাতিসংঘকে বিরত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎ সিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

আরো রহস্যময় বিষয় হলো, কৃষ্ণ সাগর ও দানুব নদী দিয়ে রাশিয়ান জাহাজগুলো যেখানে সার্বিয়ার সমরাস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য পাঠাচ্ছে, সেখানে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধ বাস্তবায়নের জন্য ন্যাটো জোটের জাহাজগুলো এড্রিয়াটিক সাগর পাহারা দিচ্ছে। এই পথে মুসলমানদের জন্যই অস্ত্র আসতে পারে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টান ক্রোশিয়ায় পাশ্চাত্যের অস্ত্র ও অর্থসাহায্য প্রচুর। ক্রোশিয়া মুসলমানদের কাছে তার উদ্বৃত্ত অস্ত্র বিক্রি করে যথেষ্ট আয় করছে।

ফ্রান্সও বসনিয়া-হারজেগোভিনায় সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহী নয়। তাই বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ছাড়া আর বিকল্প কি ব্যবস্থা থাকতে পারে? অপরদিকে বসনিয়ার সন্ত্রাসবাদী সার্ব নেতা রাদুভান কারাদজিতস বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর, জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বসনিয়ায় সামরিক বিমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হলে। জাতিসংঘের শান্তি রক্ষীবাহিনীকে শত্রুপক্ষ বিবেচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসনিয়ার মুসলমানদের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও সেখানে সামরিক বিমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার পক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জন মেজর, বসনিয়া সংক্রান্ত জাতিসংঘের জেনেভা সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান সইরাসভ্যান্স এবং জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী। ইতিমধ্যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বসনিয়ার উপর থেকে সামরিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

ডিসেম্বর ৯২-এর মাঝামাঝি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঈগলবার্গার ব্রাসেলসে বলেছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সার্বিয়ার ৭জন উচ্চাপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে নুরেমবার্গ আদালতে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের মত বিচার করা হোক। এর মধ্যে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লাভোদান মিলেসিভিটস বসনিয়ার সার্ব প্রধান রাদুভান কারদনিতস এবং বসনিয়ার সার্ব জেনারেল রাতু মালাদিতস অন্যতম। কিন্তু জাতিসংঘ বিচারের ব্যাপারেও এখন পর্যন্ত কিছু করেনি।

৯ম অধ্যায়

বসনিয়া—হারজেগোভিনায় আন্তর্জাতিক সাহায্য

বসনিয়া-হারজেগোভিনায় আজ চলছে মারাত্মক মানবকি বিপর্যয়। মানবাধিকারসহ সকল মানবিক মূল্যবোধ আজ সেখানে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। অর্থডক্স খৃষ্টান সার্ব বাহিনীর অত্যাচারে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। বিশ্ব মানবতা আজ করুণ-আর্তনাদ করছে। এমন দুঃখজনক পরিস্থিতিতে বিশ্বের বহুদেশ এগিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দিচ্ছে। বৃটিশ, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ক্রোশিয়া স্লভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বহুদেশ বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মানবিক সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের কয়েকটা দেশ উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মালয়েশিয়া ৫ লাখ ডলার, কুয়েত সরকার ৩০ লাখ দীনার এবং জনগণ আরো ৩০ লাখ দীনার, পাকিস্তান সরকার ৩০মিলিয়ন ডলার, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ৪ কোটি রূপী, বাংলাদেশ সরকার ২০ লাখ টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী ও ১০ টি বৃত্তি ঘোষণা করেছে। ৫টি চিকিৎসা, ৫টি প্রকৌশল শিক্ষার জন্য। জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দিয়েছে ২০ মিলিয়ন ডলার। সৌদী আরব সরকার প্রথম পর্যায়ে ৫ মিলিয়ন ডলার ও বাদশাহ ফাহাদ ব্যক্তিগতভাবে ৩০ মিলিয়ন রিয়াল দান করেছেন। কুয়েত, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও মিসরে বেসরকারী সাহায্য সংগ্রহের জন্য গঠিত হয়েছে বিভিন্ন কমিটি। সৌদি আরব কমিটি। ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মোট ১৯৫ মিলিয়ন রিয়াল চাঁদা সংগ্রহ করেছে।[২৯] এছাড়া ও রাবেতা আলমে ইসলামীর অধীন আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থাও বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থাও চাঁদা সংগ্রহ করেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা ক্রোশিয়া, স্লভেনিয়া ও বসনিয়ায় অবস্থিত অবরুদ্ধ ও শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক ত্রাণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মিসরের চিকিৎসক সমিতির ইসলামী ত্রাণ সংস্থার কার্যক্রমও বেশ উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও কম-বেশ সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী মসজিদগুলোতে বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানদের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, মক্কার মসজিদে হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীতে অব্যাহতভাবে দেয়া চলছে।

সৌদী আরবের ইসলামী গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াহ ও ওয়াজ দফতরের প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল আযীয বিন বাজ বসনিয়ার মুসলমানদেরকে জান-মাল দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে এক ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাদেরকে জান-মাল ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

কেননা, আল্লাহ বলেছেন, 'মোমেনগন একে অপরের ভাই।' রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'একজন মোমেন আরেক জন মোমেনের জন্য ইমারত স্বরূপ। একটি ইটকে আরেকটি ইটের সাথে গেথে ইমারত তৈরী করা হয়। এরপর তিনি এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের ভেতর ঢুকিয়ে বলেন, মোমেনের সম্পর্কে এরকম ঘনিষ্ট ও মজবুত।'রাসুলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন, 'দোয়া' ভালবাসা ও আবেগের ক্ষেত্রে মোমেনদের উদাহরণ হলো, মানব শরীরের মত। যার একটি অঙ্গ অসুস্থ্য হলে অন্যান্য সকল অঙ্গও ব্যাথা-বেদনায়, অনিদ্রা এবং জ্বরে ভুগবে।

এই ফতোয়াটি ১৬ই জুন, ১৯৯৭ সালে দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা থেকে প্রকাশিত হয়।

বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যার্থে মুসলমানদের বহু করনীয় আছে। তাই গত ৪ ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ডঃ হামিদ গাবিদ ১ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের জন্য একটি সাহায্য তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের ১শ কোটি মুসলমান ১ ডলার হিসেবে চাঁদা দিলে এই তহবিল সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। প্রতিটা মুসলমানের উচিত, বসনিয়ার মুসলিম ভাইদের দুর্যোগে এগিয়েআসা।

১০ম অধ্যায়

বসনিয়া—হারজেগোভিনায় প্রেসিডেন্টের পরিচিতি

বসনিয়া-হারজেগোভিনা রাষ্ট্রটি যার হাতে সৃষ্টি তিনি হচ্ছেন আলী ইজ্জত বেগভিটস। তাঁকে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে।

তিনি ১৯২৫ সালে বসনিয়ার এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারাজেভোতে লেখা-পড়া করেন এবং আইন ও বেসামরিক জ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও তিনি পারিবারিক পরিবেশ ও ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে এসে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আল-আজহার থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস মোহাম্মদ খানজীর ছাত্র।

এর পর তিনি ইসলামের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং ইসলামের উপর প্রবন্ধ লেখেন ও বক্তৃতা দান করেন। তিনি দেশে মুসলিম যুব সংগঠনের সাথে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৪৯ সালে তাঁকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।

তিনি পরে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি বসে থাকার লোক নন। তাই তিনি ইসলাম অধ্যয়ন শুরু করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে থাকেন। তিনি কয়কটি ইসলামী বই লেখেন। তাই তিনিসহ তাঁর কয়েকজন সাথীকে সারাজেভোতে ১৯৮৩ সালে ১৪ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

সমাজতন্ত্রের পতন ও যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙ্গনের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং পুনরায় আল্লাহর দীনের ঝান্ডাকে বুলন্দ করার জন্য জেহাদ শুরু করেন। তিনি বসনিয়া-হাজেগোভিনা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু সার্ব সম্প্রদায় তার পেছনে লেগে থাকে। ফলে, তারা আজ তাকেসহ বসনিয়ার গোটা মুসলিম জাতিকে নির্যাতন করে যাচ্ছে।

তিনি ইংরেজী ভাষায় 'Islam between East and west' এই শিরোনামে একটি বই লেখেন এবং Amerecan Trust Publication. বইটির ১ম সংস্করণ ১৯৮৪ সালে প্রকাশ করে। ১৯৮৯ সালে বইটির ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। লেখক, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের ধস নেমে আসার আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, শীঘ্রই সমাজতন্ত্রের পতন হবে। তিনি সেই পরিবর্তনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩শ এবং ২ খন্ডে বিভক্ত। উভয় খন্ডে মোট ১১টি অধ্যায় আছে। প্রথম খন্ডে তিনি দীন সম্পর্কে ৬টি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। ২য় খন্ডে তিনি ৫টি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। উভয় খন্ডে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

বইটির উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বের কাছে ইসলামকে পরিচিত করা। তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছেন।

বসনিয়ার মুসলমানদের মুক্তি ও সেবা এবং ইসলামের খেদমত তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। ইতিমধ্যে বিশ্বে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিরাট দুর্যোগের মুখে তিনি বিশ্ব জনমত ও জাতিসংঘসহ সকল আর্ন্তজাতিক সংস্থার সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তাঁর নেতৃত্বে বসনিয়ার মুসলমানদের সংগ্রামকে কবুলকরুন, আমিন।

১১ অধ্যায়ঃ

মুসলমানরা গর্জে উঠ

বসনিয়া-হারজেগোভিনা নামের গোটা একটি দেশের পুরো জনগোষ্ঠী অর্থাৎ প্রায় ৩০ লাখ লোক, নারী, পুরুষ ও শিশু আজ শরণার্থী এবং অন্যরা করুণ জুলুম-নির্যাতনের শিকার। তাদের অপরাধ কি? তারা শক্তিধর আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এটাই কি অপরাধ? আল্লাহ বলেন,

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থঃ 'শক্তিশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই তাদের উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকরা হচ্ছে, অথচ আসমান ও জমীনের বাদশাহী এবং শাসন একমাত্র তাঁর জন্যই এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর মহাপরাক্রমশালী।'

অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নন। তিনি এর কারণও জানেন। আর তা হলো, সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। সেই দ্বন্দ্ব মোমেনের জন্য একটি পরীক্ষা এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য প্রস্তুতির সুযোগ। এর মাধ্যমেই তারা সাফল্য লাভ করবে। এখানে নৈরাজ্যের কোন স্থান নেই। নিরাশ লোকেরা আল্লাহর আকাংখিত বান্দা নয়। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

আল্লাহ এ জাতীয় পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

অর্থঃ 'তোমরা সাধ্যমত তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ কর ও শক্তি সঞ্চয় কর এবং ঘোড় সওয়ারীর মাধ্যমে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুকে ভীত করে তোল।'

এই আয়াতে আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মুসলমানদেরকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।

মুসলমানের শক্তি দুই প্রকার। ১· ঈমানী ও নৈতিক শক্তি এবং ২· সামরিক শক্তি। ঈমানী শক্তি প্রথমে দরকার। তা না হয়, সামরিক শক্তি অর্জন করেও ফলভোগ করা যাবে না। তখন দুর্বল মুসলমানের মাথায় অন্যরা কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়ে চলে যাবে। আজকে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের এ অবস্থাই চলছে। মুসলমানরা নিজেরদের সম্পদ

ভোগ করতে পারছে না। অন্য জাতিই তা ভোগ করছে। অনেক মুসলিম দেশ এখন ভাল অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু তাদের অর্থ ইহুদী-খৃষ্টানদের কাজে লাগছে ও তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। তাদের ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ দ্বারা শত্রুদের পুঁজির যোগান, শিল্পায়ন ও অস্ত্র কারখানা নির্মাণের সহযোগিতা করা হচ্ছে। অথচ যাদের অর্থ তারা তা দিয়ে উপকৃত হতে পারছে না, কিংবা অন্য মুসলমানরাও উপকৃত হতে পারছে না। তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনের আগে নৈতিক ও ঈমানী শক্তি অর্জন করা দরকার।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। যাদের সামরিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাদের কথায় দুনিয়া চলে এবং জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আজ বিশ্বের ১শ কোটি মুসলমান দুনিয়ার ৩য় শক্তি। কিন্তু ঈমানী ও সামরিক দুর্বলতার কারণে তাদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রস্তাবের মূল্য ইউরোপীয় জোটের প্রস্তাবের চাইতে অনেক কম। মুসলমানদেরকে এ কথা ভাল করে বুঝতে হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দরকার আছে। নচেত, তাদের কথা কে শুনে? মুসমানের এই অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

يُوْشِكُ اَنْ تَتَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْاُمَمُ كَمَا تَتَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلَى قَصْعَتِهَا قَالُوْا: اَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ قُلُوْبِ اَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَجْعَلُ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالُوْا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ -

অর্থঃ শীঘ্রই অন্যান্য উম্মাহ তোমাদের বিরুদ্ধেএকে অপরকে আহ্বান জানাবে যেমন করে খাদ্য, পেয়ালার দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন। 'আমরা কি সেদিন সংখ্যায় কম থাকবো? তিনি উত্তরে বলেন, 'না'। বরং আমার প্রাণ সে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা সেদিন সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' সৃষ্টি করবেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়াহন' কি? তিনি বলেন, 'দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা। 'সাম্য পার্থক্য সহকারে আহমদ এবং আবু দাউদও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আজকের দুনিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা মোটেই কম নয়, বরং অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের কোন মূল্য নেই। আমাদেরকে বন্যার ফেনাবা গাদ-এর মত বিবেচনা করা হয়। কেননা, আজকে মুসলমানরা দুনিয়াদার হয়ে পড়েছে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা শুরু করেছে। তাই এই বিরাট জনশক্তি সত্যিকার অর্থে কোন প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। তাই মুসলমানদেরকে শক্তিতে পরিণত হতে হবে।

শত শত বছর ধরে মুসলিম মিল্লাহ শক্তিহীন অবস্থায় ঘুমিয়ে আছে। আজ তাদেরকে জাগতে হবে এবং খালেদ,তারেক, মুসা বিন নাসীরের মত বীরের ভূমিকা পালন করতে হবে। নচেত, তাদেরকে ধ্বংস করা হবে, যেমন করে বসনিয়ার মুসলমানদেরকে রাস্তাঘাটে ভেড়া-বকরীর মত দিনে-দুপুরে জবেহ করা হচ্ছে। অস্ত্রের অভাবে তারা আজ শত্রুর মেকাবিলা করতে পারছে না। মুসলমানদেরকে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পারমাণবিক অস্ত্র, আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান ও ট্যাংকসহ অন্যান্য সকল অস্ত্রের অধিকারী হতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবছর মুসলমানরা যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনে, সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে অস্ত্র কারখানা তৈরি করে সহজেই অস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। সেজন্য মুসলমানদেরকে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে হবে।

আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন না করলে কেউ এসে ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়ে যাবে না। এ কথাই আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

অর্থ-'আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য সে পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে।'

মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পরিকল্পনা নিলে আল্লাহ তাদের সেই চেষ্টা কবুল করবেন। সত্যের জয় সুনিশ্চিত। বসনিয়ার মুসলমানরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। 'দুঃখের পরে অবশ্যই সুখ আসবে' (সুরা-আলাম নাশরাহ) কাজেই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ আরো বলেছেন' 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' (বাকারা)।

সার্ব সম্প্রদায় যদি বসনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংসও করে দেয়, তথাপি, সেখানে ঈমান ও জেহাদের তুষের মৃদু আগুন জ্বলতে থাকেবে এবং একদিন জালেম সার্ব সম্প্রদায়ের সকল কিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানরা গোপন গেরিলা আন্দোলন চালাবে। অপরদিকে, মাকদুনিয়া, কসোভো ও সঞ্জাক টিকে থাকতে পারলে বসনিয়া থেকে ইসলামের বাতিকে ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। সম্মিলিত জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানরা আবার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হবে। সে জন্য দরকার বলিষ্ঠ ঈমান ও মজবুত নৈতিক শক্তি। আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ -

অর্থ–তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।'

আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো, তার দীনকে সাহায্য করা। আসুন, আজকে আমরা সবাই আল্লাহর দীনের ঝান্ডা বহন করে এগিয়ে যাই ও বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসি।

পরিশিষ্ট

১, দৈনিক আম–শারকুল আওসাত, জেদ্দা, ২৪শে ডিসেম্বর–১৯৯২,

২· আল বুসেনা ও ওয়ালহারসেক–ইনা, জেদ্দা।

৩· আল বুসেনা ও ওয়াল হারসেক–ইনা, জেদ্দা।

৪· আল–মোসলিমুন জেদ্দা, ১৯ শে জুন–১৯৯২, শুক্রবা সংখ্যা।

৫· দৈনিক আশ্‌শারকুল আওসাত–জেদ্দা–২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯২

৬· সৌদী গেজেট, জেদ্দা, ২র ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা।

৭· সাফহত মিন তারীখ জমহুরিয়াহ আল বুসেনা ওয়াল হারসেক, আবদুল্লাহ মোবাশ্বের আত্তরাজী প্রকাশকাল–১৯৯২, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা।

৮· দৈনিক আল–মদীনাহ–জেদ্দা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।

৯· দৈনিক আল–মদীনা –জেদ্দা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা।

১০· সাপ্তাহিক আদদাওয়াহ– রিয়াদ, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা।

১১· দৈনিক আলমদীনাহ –জেদ্দা, ২৪ শে নবেম্বর, ১৯৯২ খৃঃ।

১২· সৌদী গেজেট ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯২

১৩· সৌদী গেজেট –২রা ডিসেম্বর, ১৯৯২

১৪· দৈনিক আশ্‌–শারকুল আওসাত, জেদ্দা– ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা।

১৫· দৈনিক আল–মদীনা, জেদ্দা, ৮ই ডিসেম্বর –১৯৯২ সংখ্যা।

১৬· দৈনিক আল–মদীনা–৮ই ডিসেম্বর–১৯৯২

১৭· দৈনিক আল–মদীনা–৮ই ডিসেম্বর–১৯৯২

১৮· দৈনিক ওকাজ– জেদ্দা, ২৩শে ডিসেম্বর, '৯২

১৯· ১৭ই ডিসেম্বর –১১৯৯২ সংখ্যা।

২০ ওকাজ জেদ্দা –২৩শে ডিসেম্বর –'৯২

২১· দৈনিক আল–মদীনাহ–জেদ্দা–৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

২২· সৌদী গেজেট, জেদ্দা, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯২।

২৩· দৈনিক আল–মদীনাহ–১১ই ডিসেম্বর–১৯৯২, জেদ্দা।

২৪· দৈনিকআল–মদীনা,জেদ্দা,১৬–১২–৯২।

২৫· নিউজ উইক, ১৭ ই আগস্ট, ৯২।

২৬· নউজ উইক, ১৭ ই আগস্ট, ৯২।

২৭· নিউজ উইক, ১৭ ই আগস্ট, ৯২।

২৮· দৈনিক আল–মদীনা, জেদ্দা, ১৬/১২/৯২

২৮· দৈনিক আশ–শারফুল আওসাত ঃ জেদ্দা, ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯৯২।

২৯· সাপ্তাহিক আদ–দাওয়াই–রিয়াদ–১০ ই ডিসেম্বর ১৯৯২

লেখকের অন্যান্য বই

১। মক্কা শরীফের ইতিকথা,

২। মদীনাহ শরীফের ইতিকথা

৩। আল–আকসা মসজিদের ইতিকথা

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা

৫। ইসলামের দৃষ্টিতে গান–বাদ্য ও ধূমপান

৬। ইসলামের চারটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়

৭। ভাল মৃত্যুর উপায় ও খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার পদ্ধতি

৮। রমজানের তিরিশি শিক্ষা

৯। ইসলামে মসজিদের ভূমিকা

১০। কালেমা শাহাদাতঃ এক বিপ্লবী ঘোষণা (অনুবাদ)

১১। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা "

১২। মদ জেনা ও সমকামিতার পরিণাম "